মরণোৎসব

শ্রীসরলা বসু রায়

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

৭নং মুরলীধর সেন লেন,

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

১৩৪৯

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

অজন্তা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

কলিকাতা

এক টাকা

পিতৃচরণে—

চুঁচুড়া
মহালয়া ১৩৭৯

সরলা

সূচী

মরণোৎসব

চব্বিশ বছরের তরুণ তপন যেদিন প্রায় সারাদিন ধরে ফুটবল খেলে এসে অবেলায় ঘু'ঘণ্টা ধরে স্নান করে ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হল, সেদিন যেন বাড়ীটা উৎসব বাড়ীর মতই সরগরম হয়ে উঠল। বিখ্যাত বসু বংশের একমাত্র বংশধর, মা বাপের একমাত্র নয়নের মণি, ও প্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ধনী মানী অমর ঘোষের আদরিণী প্রথমা কন্যার জীবন-তরণীর কর্ণধার, এবং দু'টী অপোগণ্ড শিশুর পিতৃপদাভিষিক্ত, তরুণ তপনের মতই কান্তি বিশিষ্ট এবং বহু সদ্‌গুণের অধিকারী তপন কুমারের তিরোধানের আশঙ্কায় সবাই রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল। পিতা মাতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ছেলের দু'পাশে বসে রইলেন, আঠার বছরের বধূ রেখা লজ্জা সরম পরিত্যাগ করে সর্ব্বক্ষণই স্বামীর পায়ের তলায় আশ্রয় নিল। তপনের একমাত্র ভগিনী 'তারা' বড়ই আদরের, সর্ব্বক্ষণ তার আদর আবদারের জ্বালায় বাড়ীশুদ্ধ ব্যতিব্যস্ত সেও চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রোগীর ঘরের এককোণে আশ্রয় নিয়েছে, তপনের দু'টী ক্ষুদ্র শিশুপুত্র ও কন্যা বহুবারই চাকর দাসীর সতর্ক প্রহরা থেকে পালিয়ে এসে রোগীর ঘরে ছল ছল নেত্রে উঁকি দিয়ে দেখছে সাহস করে ঘরে ঢুকতে পাচ্ছে না কিন্তু তাদের ক্ষুদ্রপ্রাণটুকু এই ঘরেই পড়ে আছে। কলিকাতা সহরের সেরা সেরা ডাক্তাররা ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা অন্তর এসে রোগী দেখে মত প্রকাশ

করছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব ব্যবস্থা হচ্ছে। শ্বশুর বাড়ী গ্রে ষ্ট্রীট হতে দু'ঘণ্টা অন্তর জামাইয়ের খবর নিতে লোক আসছে, বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান, বড় সাধের নাত জামাইয়ের জীবন সংশয় পীড়ার খবরে বুড়ীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে, তবু শাশুড়ী ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরাও দুপুরে এসে রাত পর্য্যন্তই এ বাড়ীতে পড়ে আছেন। তপনের 'মা' খেতাবধারী রাজার একমাত্র মেয়ে, তপনের মাতামহ-মাতামহীও বর্ত্তমান; একমাত্র শত আরাধনার দৌহিত্রের জীবন সংশয় পীড়া, তাঁরাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পড়ে আছেন, তিন মামা, ঘণ্টা অন্তর কলেজ ষ্ট্রীটে বসুদের বিরাট অট্টালিকায় পদার্পণ করছেন, ভাগিনেয়র খোঁজ খবর নিতে, এবং চিকিৎসার কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা তদারক করতে। তপনের ছয় পিসি, সব কলিকাতারই বিখ্যাত ধনী গৃহিণী, তাঁরা সংবাদ পেয়ে পিতৃবংশের একমাত্র কুলপ্রদীপের জন্য অধীর চিত্তে শ্বশুর গৃহ ত্যাগ করে এখানেই পড়ে আছেন, সুন্দর, অমায়িক, গুণী, মানী, ধনী, তপনের অসংখ্য বন্ধু, তারা সর্ব্বক্ষণ আদেশানুরোধের অপেক্ষায় এখানেই উপস্থিত আছে, যদি এই বিপদের বাড়ীতে কোন কাজে লাগে, তবে কৃতার্থ হয়। তপনকে মানুষ করেছে যে দাসী ও চাকর, ছোট থেকে দেখছে যে সব দাসী ও চাকরের দল, ও গুণবান তপনের কাছে উপকার পেয়েছে যে সব কর্ম্মচারী, সরকার, গোমস্তা, দারবানের দল, তারাও সংগোপনে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে তপনের নিরাময় হওয়ার জন্য। বাড়ীতে শান্তি স্বস্ত্যয়ন, নারায়ণের তুলসী দেওয়া, বিশেষ পূজার ব্যবস্থা, কালিঘাটে পূজার ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণকে গো দান প্রভৃতি কিছুই বাদ যাচ্ছে না,

কর্ত্তার কাছে গিয়ে যে যা তপনের জন্য ক'রতে ইচ্ছা করছে, তিনি তখনই তাতে মত দিচ্ছেন। জলের মত অর্থব্যয় হচ্ছে, বসু বংশের অগাধ ঐশ্বর্য্যের শেষ কপর্দ্দকও তপনের জন্য ব্যয় করতে কেউ ইতস্ততঃ করবার নেই। বাড়ীর ব্যবস্থা দেখে শুনে বাড়ীর সরকার নিজেই, এখন চারজন চাকর দু'জন রশুয়ে বামুন ও দু'জন ঝি অতিরিক্ত বহাল করেছে, এ সময়ে বাড়ীর কর্ত্তাকে জিজ্ঞেস করে আর ব্যস্ত করতে যায়নি। 'সে তখন হবে'খন, এখন আগেতো খোকাবাবু ভাল হোক্', বাড়ীতে দুবেলা উৎসব বাড়ীর মতই রন্ধনের আয়োজন হচ্ছে, কারণ খোকাবাবুর শ্বশুর বাড়ী, মামার বাড়ী, পিসির বাড়ীর সব সর্ব্বক্ষণই এখানে, মানুষের আহার তো চায়ই—কাজেই তার উপর খোকাবাবুর একশত দেড়শত বন্ধুর ভোজনাদিও প্রত্যহ এখানেই হচ্ছে, তারা কেউ তপনের অমন অসুখ দেখে তো বাড়ী যেতে পারে না।

এত চেষ্টা, এত ব্যাকুলতাও তপনের অমূল্য জীবনকে ধরে রাখতে পারল না, মধ্যে ছয় দিন মাত্র, এক বৃহস্পতিবার বৈকালে জ্বর দেখা দিল, পরের বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় সবার জীবনের জীবন তপন অস্ত গেল। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' শত চেষ্টা নিয়তিকে রোধ করতে পারে না। সে সন্ধ্যার দৃশ্য লেখনীতে ফুটে না। মা, বাপ দু'হাতে ছেলেকে জড়িয়ে মূর্চ্ছিত, বধু পায়ের উপর মূর্চ্ছিত, জীবিত কিনা বুঝা যায় না, ভগ্নী তারা মাথা খুঁড়ে রক্তের ঢেউ বহিয়েছে, পিসিরা আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করছে, চাকর বাকরের দল মাথা খুঁড়ছে, বন্ধুদের দল বুক চাপড়ে আছাড় পিছাড় করছে, ননীর পুতুল শিশু দুটি ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে একবার বা বাপ, মাকে, নাড়া দিয়ে তাদের বুকে পড়ে

কাঁদছে ও ডাকছে, হায় অবোধরা তাদের কি সর্বনাশ হয়েছে তা বুঝতেও যেন পারছে না। শ্বশুর বাড়ী খবর পৌঁছেছে সেখানে খাশুড়ী দিদিশাশুড়ী অজ্ঞান অচৈতন্য, ডাক্তার এসেছে বরফের চাদর নিয়ে চাকর বাকর ছুটা ছুটী করছে। ওখানে মামার বাড়ীও খবর গেছে হঠাৎ পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ মাতামহর উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ডাক্তার বলছেন হঠাৎ শক্ লেগে এটা হয়েছে ; তাঁকে ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, মাতামহীর অবস্থাও এখন তখন।

এতগুলি লোকের প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন অমূল্য ধনকে এমন সতর্কতার মধ্যেও চোরে চুরি করল যে, গৃহস্থের সহস্র সজাগ দৃষ্টিও তাকে রাখতে পারল না।

অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে

স্তব্ধ মধ্যাহ্ন, মিষ্টার এন্ কে সেনের বাংলোর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের আরাম সোফায় একটী সুবেশা সুরূপা তরুণী অলসভাবে অর্দ্ধশায়িতা হইয়া সুমিষ্ট স্বরে রবিবাবুর "গীতাঞ্জলী" পড়িতেছে, তার চারিপাশে আরও কয়েকটি তরুণী নিবিষ্ট মনে উহা শুনিতেছে।

"আমার মাথা নত করে দাওগো তোমার
চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান;
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।"

অরুণা বলে উঠল, "কি সুন্দর! রবিবাবুর লেখা তো সুন্দরই, কিন্তু রবিবাবুর তৈরি জিনিষ তোর কাছে যেন প্রাণ পায়, কী সুন্দর আবৃত্তি করিস ভাই তুই রেখা, এত মিষ্টি কারুর পড়াই লাগে না, তুই যেন প্রাণ দিয়ে রবিবাবুর কথাগুলি অনুভব করিস্, তাই তোর পড়ায় এত অমৃত ঝরে।"

মৃদু হেসে রেখা বলে উঠল, "তোরা আমায় খুব ভালবাসিস কিনা, তাই এত প্রশংসা করছিস, রবিবাবুর লেখায় প্রাণ সাড়া দেয় না, এমন কয়জন আছেরে? তিনি সকল মানুষের সকল অবস্থার প্রাণের "চাওয়া" "পাওয়া" ছন্দবদ্ধ করেছেন, যার যেমন ইচ্ছা, অভিরুচি, প্রয়োজন সে তাই নিয়ে প্রাণে শান্তি পায়, সাধে কি আর জগত তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবির আসন দিয়েছে।"

এমন সময় বাহিরে একটী তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, "কাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিচ্ছিস্ রে তোরা, আমাকে নাকি?"

বই রেখে রেখা উঠে বসল, বলল "ভাই গীতা তাইতো তোদের বাড়ি দুপুরে যাবার কথা ছিল একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুমরে, নাঃ ভারি ভুলো মন হয়েছে ভাই আমার, তা তুই এসেছিস ভাই ভালই হয়েছে।"

গীতা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "তা মহম্মদ যদি পর্ব্বতের কাছে না যায়, অগত্যা পর্ব্বতই আসবে।"

রেখা অপ্রস্তুত ভাবে বলে উঠল, "ভাই রাগ করেছিস?"

গীতা বলল, আমার রাগ করার বিশেষ কারণ নেই, আমি এটা জানতুমই, তবে ঝর্ণা ভয়ানক রেগেছে, এবং তোমার সঙ্গে জীবনে আর কথাই বলবে না এ প্রতিজ্ঞাটাও করে ফেলেছে; কিন্তু মুকুলই তাকে বেশী রাগিয়েছে; কেননা ঝর্ণা যখন বলল, 'আজ তুমি এসেছ, সে জন্যে এরা সবাই খুসী মনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমোদ-আহ্লাদ করতে এসেছে, আর সেই আমার সবচেয়ে বন্ধু, তারই এমন অবহেলা-এর শোধ আমি কিন্তু নেবই।"

একথায় মুকুল বলল হেসে, 'আমি এসেছি. বলেই না তিনি আসেন নি. তিনি তো আমাদের তাঁর সঙ্গে মেশার যোগ্য বলেই মনে করেন না. দেখতে পাই; তাই আজ প্রায় চার বছর বিয়ে হলেও তোমার প্রিয়বান্ধবীকে সেই বিয়ের রাত্রে যা দেখেছি. আর একবার,' তাও নেহাত আকস্মিকভাবে; আর এমন গম্ভীর যে কথা বলতেই ভরসা হয় না, সেই তিনি আসবেন বলে কেনই যে বৃথা আশা কর, আর মনোকষ্ট পাও, তোমারই বন্ধু—আর তুমিই তাঁর প্রকৃতি জান না আশ্চর্য্য! হয় তিনি অপ্রকৃতিস্থ. নয় দারুণ দাম্ভিক।" এর পর বুঝতেই পারছ, ঝর্ণার মনের অবস্থাখানা. জানতো সে কি রকম তোমায় ভালবাসে?, তোমার নিন্দা শুনলে ক্ষেপে যায় একেবারে, ভাগ্যে না তারই বর মুকুল, তার প্রিয়বন্ধুকে অমন মিষ্ট মিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করল অন্য কেউ হলে রক্ষা ছিল কি? তুই-ই বল না ভাই।"

রেখা অন্যমনস্ক ও বিমর্ষভাবে আঁচলটা হাতে শুধু জড়াতে লাগল উত্তর দিল না কিছু।

গীতা কিয়ৎক্ষণ পরে আঁচলের তলা থেকে একখানি ফিকে নীল রংয়ের খাম বের করল, সঙ্গে সঙ্গে সব কজন তরুণীই হুড় মুড় করে এসে গীতাকে ছেঁকে ধরল, "ওরে হ্যাঁতো, আজই যে বিলেতের ডাক আসবার দিন, আমাদের তো মনেই ছিল না, গীতা কি লক্ষ্মী মেয়ে ভাই চিঠিখানা নিজেই এনেছে।"—বলে সকলে সেই চিঠি পড়ায় মগ্ন হয়ে গেল।

চিঠির ভেতর মৃদু সুগন্ধ, পত্র প্রেরকের সুরুচি, ও উৎফুল্ল মনের পরিচয় দিতেছিল, চিঠি পড়া হলে সবাই মুগ্ধ মনে বলল, কি সুন্দর

চিঠি অমিতবাবু লেখেন ভাই, এর ঠিকমত জবাব তুই দিতে পারিস্‌তো? দেখিস যেন হারাসনি। না হয় রেখাকে দিয়ে লিখিয়ে নিস ভাই যেখানটায় তোর আটকাবে, ঐ আমাদের একটা মাত্র তো ভরসা আছে।"

ঠোঁট উল্টে গীতা উত্তর দিল, "ছাখ্‌ গিছে বকিস্‌নি ও আবার চিঠির উত্তর লিখে দেবে, সেই মেয়েই কিনা; চিঠিখানা পড়াতে পারিস তো পাঁচ টাকা বাজি রাখছি আমি।"

অবশ্য কথাগুলি চলছিল নিম্নস্বরে ঘরের একধারে গিয়ে, চিঠি পড়া ও কথাবার্ত্তা চলছিল।

অরুণা বলল, "শাঃ চিঠিখানা নাকি আবার পড়াতে পারব না, তোদের ~ বাড়ান কথা, ওর কৌতূহল তেমন আমাদের মত নেই, তাই চিঠি কাড়াকাড়ি করে পড়ে না, নইলে দিলে আবার পড়ে না। 'দেতো' বলে চিঠি হাতে রেখার কাছে এসে দেখল, সে চোখ বুজে শুয়ে আছে. অরুণা বলল, গীতার বর অমিত কি সুন্দর এই চিঠিখানা লিখেছে, পড়ে দেখ রেখা। আমরা তো সবাই পড়েছি, তুই ঘুমচ্ছিস নাকি রে?"

রেখা উত্তর দিল "না তো, কিন্তু অমিতবাবু তোকে লিখেছেন না কি?"

অরুণা রেগে উত্তর দিল, "সব তাতে ঠাট্টা ভাল লাগে না ভাই, দেখই না কাকে লিখেছে।"

রেখা ফের বলে উঠল, "চিঠিটা কে লিখেছে, বললি?"

অরুণা রেগে বলে উঠল, "তোর কি হয়েছে রেখা, তুই কি

আজকাল কারুর কথা বুঝতে পারিস্ না ? গীতার বর অমিত লিখেছে। এবার বুঝলি ?"

"তবে ? ওতো গীতার বর গীতাকে লিখেছে, পড়বে গীতা, তোরা ও নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে মরছিস কেন ?" এই কথা রেখা বলল।

গীতা উত্তর করল, "আমি তোকে বলছি পড় না তুই, ওরা সবাই পড়ল, আর তোকে পড়াতে কি আমার আপত্তি।"

রেখা উত্তর দিল, "কিন্তু তুই তো জানিস্ ভাই আমি কারো চিঠি পড়া ভালবাসি না, আর কখন পড়িও না।"

গম্ভীর মুখে গীতা বলল, "বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি পড়বি না, তবে কার চিঠি পড়বি শুনি ? সবাইতো পড়ে কাড়াকাড়ি করে, তোর সবই অদ্ভুত।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আচ্ছা না পড়িস্ নাই পড়বি, আজকের দিনটাই না হয় আমাদের কথা রেখে পড়।"

রেখা একটু চুপ করে রইল, তারপর গীতার হাত ধরে বলল, "ভাই যা আমি করি না, তা করিই না। একদিন করে পাঁচদিন করব না, এ ঠিক নয়, তোরা তো জানিস্ ও কি রকম নেশার জিনিষ, একদিন পড়লেই পাঁচদিন ইচ্ছে যাবে, তার চেয়ে ও স্বাদ না জানাই ভাল। লক্ষীটি গীতা মনে করিস্নি কিছু ভাই।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

গীতা বলল "একটা কথা বলি, কিছু মনে করবিনি তো ?"

রেখা বলল, "নিশ্চয়ই না, আমি চব্বিশ ঘণ্টাই তোদের মনে ব্যথা দিচ্ছি, তবু তোরা রাগ করিস্ না, আর আমায় একটা কথা বলবি, তাতেই রাগ করব, এ হতে পারে কখন ?"

তখন গীতা বলল, "তোর বরের চিঠি এলে তুই নাকি সেটা পড়ে, তোদের ঘরের ড্রেসিং টেবিলের একটা খোলা ড্রয়ারের মধ্যে, যেখানে নাকি তোর মায়ের অপঠিত চিঠিপত্র প্রত্যহ চাকররা রেখে যায়, তিনি সময় মত পড়বেন বলে, সেইখানেই রেখে দিস্, এ নাকি জ্যোৎস্না নিজ চক্ষে দেখেছে, আর তোর মা, সেই চিঠি পড়ছেন, এও নাকি সে নিজের চোখে দেখেছে, এর মানে কি ভাই ? তোর কি একটু লজ্জাও করে না মা'কে ঐ চিঠি দেখাতে ? যত লজ্জা বন্ধুদের চিঠি পড়তে না ? সাধে আর লোকে তোকে অদ্ভুত বলে।"

রেখা একটু হেসে জবাব দিল, "সে কি আর তোদের মতন অমন মজার চিঠিরে, যে সুগন্ধে মন মাতাবে, আর আলপিন বেঁধা বিশ পৃষ্ঠা চিঠি, প্রায় একখানা বই বললেই হয়। সে হচ্ছে সংসারে অনভিজ্ঞ আমার প্রতি পতিদেবতার অমৃত উপদেশ আদেশপূর্ণ চিঠি ; কোন্ কোন্ বিষয়ে আমার এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে যেতে হবে এবং বাপের বাড়ি হতে এইবেলা কি রকম কৌশলে আদায় করে নিতে হয় আর গেরস্ত ঘরের বৌ ঝি হয়ে, বিবিয়ানী করে না বেড়াই, সে সম্বন্ধে সাবধান বাণী প্রভৃতি শ্রীমুখের যত কিছু উপদেশবাণী, সে সব মাকে না দেখালে কাকে দেখিয়ে তার অর্থ করে নিয়ে তাঁদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিক্ষালাভ করব ভাই ? তাছাড়া কি জানিস ভাই, মায়ের কাছে কোন কিছু লুকোতেই যেন আমার বেশী লজ্জা করে, ভাই,

দেখাতে লজ্জা করে নাতো। না দেখালেই যেন কেমন পর পর লাগে, তা' হবে আমার সব অদ্ভুত।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্ততঃ করে গীতা বলল, "দেখ ভাই একটা ছোট্ট পদ্য করে দে না।"

হেসে বললে রেখা, "কি রকম, সেই 'যাও পাখী বোলো তারে' গোছের নাকি ?"

হেসে জবাব দিল গীতা. "যাঃ ঠিক কি আর ঐ রকম বলছি আমি, তুই চিঠিটাতো পড়লি না ভাই, তাহলে বুঝতে পারতিস্ কি রকম।"

রেখা বলল, "বুঝতে খুবই পারছি তোদের ব্যাপারখানা, তোর শ্বশুরের ভাই, বিচক্ষণ লোক হয়ে এটা বোঝা উচিৎ ছিল যে, ছেলের সঙ্গে বৌটাকে পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া। ভদ্রলোকের তো আর পয়সার অভাব নেই, তাহলে আর ছেলেটা হা'হুতাশ করে, বড় বড় চিঠি লিখে সময় নষ্ট না করে, সেটা পড়াতেই দিতে পারত শান্ত মনে। তারপর কয় মিনিট মাথা নিচু করে ভেবে নিয়ে বলল, 'সুমেরু কুমেরু ব্যবধান', (তবু) ক্ষণে ক্ষণে মিশে প্রাণে প্রাণ। কেমন চলবে ?"

মৃদু হেসে গীতা বলল, "চলবে।"

রেখা হাসিমুখে বলল, "দেখ তোদের যে রকম ভাব, তাতে এ'ও লিখতে পারিস্ তুই।"

হারোনারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ ভীরুণা।
ইদানীমন্তরে জাতাঃ পর্ব্বতাঃ সরিতোত্ক্রমাঃ।
"হে প্রিয় বিচ্ছেদ ভয়ে কণ্ঠে কভু পরি নাই হার,
আজ দুজনের মাঝে নদী, গিরি, সাগর কান্তার।"

হাসিমুখে গীতা বলল "দেখ ভাই এই জন্যই তোকে আমাদের চাই-ই ; কি সুন্দর এইগুলো আমায় বলে দিলি ভাই, 'সে' ভারী খুসী হবে, আমি সাতজন্ম ভেবেও এসব বুদ্ধিতো মাথায় আনতে পারতাম না। যাই আজ ঝর্ণাকে তোর 'ক্ষণে ক্ষণে মেশে প্রাণে প্রাণে' এই মিষ্টি পদ্যটা বলি গিয়ে, সে একেবারে জল হয়ে গিয়ে মুকুলের সঙ্গে তোকে অমন সব অপূর্ব্ব বিশেষণে বিশেষিত করার জন্য, খুব খানিক ঝগড়া করুক, মুকুলেরও শিক্ষা হয়ে যাক। তোর বিরুদ্ধে কিছু বলবার সাহস আর কোনদিন না হয়। তুই যা করিস্, তার নিশ্চয়ই মস্ত মানে আছে, এবং তা ভালই ; মন্দ কিছু তোর দ্বারা হতেই পারে না, এই ভেবে নিয়ে তোর কাজের সমালোচনা আর কেউ যেন না করে।"

রেখা হেসে বলল, "ইস্ ভারী যে খুসী, তাই আমায় একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলে দিচ্ছিস্।"

পরদিন বেলা তখন আটটা মস্ত লম্বা দালানে রেখা একটা সেলাই হাতে নিয়ে পায়চারি করতে করতে দেওয়ালে টাঙ্গান কার্পেটের উপর উল দিয়ে লেখা, He who is on the Path exists not for Himself, ,but for others ; He has forgotten Himself in order that He may serve them. এই কথা কয়টার কাছে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে পড়ছে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে ; এমন সময় ঝর্ণা ও গীতা পিছন থেকে কলকণ্ঠে হেসে বলে উঠল, 'বারে মেয়ে! সকাল বেলাই নিবিষ্ট মনে ঐ লেখাটা পড়বার ঘটা দেখ না, 'পরের জন্য নিজেকে ভুলে যাও' ভাল, ভাল, তুমি তাই যাওগে, আমরা তা যেতে রাজি নই বলে, আত্ম রেখে ধর্ম্ম তবে পিতৃলোকের কর্ম্ম।"

রেখা হাসিমুখে বলল, "রোজ সকালে একবার করে এই কথা কটা আবৃত্তি করবি, আমি দু'একদিনের মধ্যেই এই রকম লিখে তোদের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেখবি এটা মন্ত্রশক্তির মতই কাজ করবে ; রোজ সকালে এই কথা কটার ইনজেক্সান মনের মধ্যে নিবি, তাহলে আর 'আত্ম রেখে ধর্ম্ম', একথা না বলে 'আত্ম ত্যাগে ধর্ম্ম' এই কথাই বলবি বুঝলি ? সে যাই হোক সকালেই কি মনে করে সব, কাল না ঝর্ণা আমার উপর বড় রেগেছিলি ?"

ঝর্ণা বলল, হাঁ, হাঁ, রাগ তো করেইছি, আসতুম না কক্ষনো নেহাত গীতা ধরে নিয়ে এল তাই ; আমরা একটু মার্কেটে চলেছি, মায়ের ইচ্ছে আজ দু-একজন বন্ধু-বান্ধবদের খেতে বলা, কাল তাঁর জামাইচন্দ্র অনেকদিন পরে, অনেক সাধ্য সাধনায় যখন শ্বশুর বাড়িতে উদয় হয়েছেন, তখন একটু আমোদ আহ্লাদ করা আর কি। আর আমাদের প্রোগ্রাম এই যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার মিটলেই, জন কতক বন্ধু বান্ধব নিয়ে চাঁদপাল ঘাট থেকে ষ্টিমার করে 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে' যাওয়া এবং সেখানে আমোদ প্রমোদ বেড়ান আর কি ; আর তো আজকের দিনটিই মেয়াদ, ছুটি নেই, কালই চলে যাবে। আমার শরীরের এই অবস্থা—মা তো পাঠাবেন না এখন আমায় ভাই, আর উনিও এখন কিছুদিন আর আসতে পারবেন না। এক তো সাহেবী ফ্যাসানের বাড়ি, খানসামা, বাবুর্চ্চি, এজন্য বিরাগ, তায় নিরামিষ খাওয়ার হ্যাঙ্গামা। মাকে নিজে হাতে সব ব্যবস্থা করতে হয় রান্নার, আমাদের সাধারণ রান্নাঘরে তো আর তাঁর চলে না।"

রেখা বলল, "হাঁ মুকুলবাবুর কার্য্যকলাপ শ্রদ্ধার যোগ্য বটে, বিলাত

ফেরতের ছেলে হয়ে, বিলাতী আদব কায়দায় বিরাগ, নিজহাতে চরকা কাটেন, খদ্দর পরেন, নিরামিষাশী, বিলাসিতা, বাবুয়ানীর ঘোর বিরোধী, এমনটী আজকাল বিরল বটে। তবে বৌ'টি যে হয়েছে বিলিতি ফ্যাসানের মেয়ে, সেটীকে তো আর বর্জ্জন করে বীরত্বের পরিচয় দেবার শক্তি নেই। সেদিকে যে অন্ধ দেবতাটীর খেলা আছে, তার খাতিরে তাঁকে 'শেলি', 'বায়রণ' 'সেক্সপীয়র'কে নিয়ে প্রেমের দর্শন, অধ্যয়ন করতে হয়, না ভাই ঝর্ণা ?"

ঝর্ণা উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই—বৌয়ের সব কিছুই গুণ ভিন্ন দোষ চোখেই পড়বে না, তবেই না ভালবাসা ; সে যে ফ্যাসনের হোক্ না তাই মিষ্টি ; আর ক্রমশঃ সেই ফ্যাসনেরই ভক্ত নিজের অজ্ঞাতসারে হয়ে পড়তে হয়রে, ভালবাসার এমনই মহিমা, আর ভালবাসার জন প্রকৃতই যদি দোষের কাজ করে, তা'তে কেবল একটু মনে কষ্ট হয় মাত্র, তাকে মাপ করতেও দেরী হয় না, আর পরিত্যাগ করা কল্পনায়ও আসে না।"

এমন সময় রেখার মা সেই দালানে এলেন, ওদের কথায় বাধা পড়ল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মা—তোমরা সকালেই ?"

ওরা উত্তর করল, "হাঁ মাসিমা একবার মার্কেটে যাচ্ছি, আর রেখাকেও বলতে এলুম।"

গীতা বলল, "মুকুল এসেছে কি না, তাই মা ক'জন বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণের জোগাড় করেছেন।"

রেখার মা' আর কিছু না বলে সেই দালানের একধারে ফল ছাড়াতে বসলেন।

ঝর্ণা, গীতা, দু'জনেই বলে উঠল, "ভাই রেখা তোকে আজ আমাদের সঙ্গে যেতেই হ'বে, খাওয়া দাওয়া ওখানেই হবে, বিকেলে আমরা সবাই যা' প্ল্যান করেছি, বল্লুমতো শুনলিই, তোকে আজ আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে, তুই তো বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে বরাবরই ভালবাসিস্, নে ভাই প্রস্তুত হয়ে নে, আমরা এই মার্কেট থেকে ফিরে তোকে তুলে নিয়ে তবে যাব, আর না হ'লে আমার রাগ তো জানিস্।', রেখা স্মিত মুখে একটা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে গিয়ে একবার আরচোখে মা'য়ের মুখ দেখবার চেষ্টা করল, দেখতে পেল তিনি উদ্বেগ ব্যাকুল চোখে তারই মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

রেখার মুখের ভাব তখনি বদলে গেল, একটু মাথা চুলকে বিপন্ন ভাবে বলল, "ভাই ঝর্ণা কিছু মনে করিসনি ভাই, আজ যে আমার যাবার জো নেই একেবারেই।"

গম্ভীরমুখে ঝর্ণা জিজ্ঞাসা করল, "কেন? সেটা বলতে বাধা আছে কিছু?"

রেখা বলল, "না বাধা কি, আজ যে 'ওঁর' আসবার কথা আছে, কি করে যাই।"

ঝর্ণা বলল, "ওঃ তাতে কি, তোকে তো আর রাত্রি পর্য্যন্ত আটকে রাখব না, সে ঠিক পৌঁছে দেবো এখন ভয় নেই তোর।"

রেখা উত্তর দিল, "তুই তো জানিস ঝর্ণা ওরা সে মোটেই ভালবাসে না, যে আমি কোন পার্টিতে যোগ দিই, গেছি শুনলে যে আগুন হয়ে

উঠবে ভাই, জানিসতো ভাই সব, তবু কেন বৃথা অবুঝের মত কথা বলছিস্?"

ঝর্ণা, গীতা গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, "আচ্ছা আসি তাহলে. কাল পারিতো সব এসে, সে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা শুনো করে যাব, কাল রবিবার ছুটি, অতএব তিনি নিশ্চয়ই থাকবেন. আমাদের এ বিষয়ে আপত্তির চেয়ে আগ্রহই বেশী জানিসতো?"

দুঃখিত মনে ম্লানমুখে ওরা চলে গেল। রেখা অবসন্ন মনে বসে পড়ল একটা সোফার উপর. সেলাইটা ফেলে দিয়ে।

বেলা ন'টার পর রেখার দাদার ঘর থেকে ডাক এল, তাঁর খানসামা এসে ডাকল "এখনই একবার চলুন সাহেব ডাকছেন।"

রেখা সেখানে গিয়ে দেখল দাদা কতকগুলি রকম বেরকমের 'ব্রোচ' দেখছে, রেখার দিকে চেয়ে বললেন "বস ঐ চেয়ারখানায়।" রেখা বসতে সেই 'ব্রোচ'গুলো তার দিকে এগিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে বললেন, "নে কোন্‌টা তোর পছন্দ হয় বেছে নে, একেবারে নতুন ডিজাইন।"

রেখা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "দাদা আমার তো রয়েছে, আর তো এখন দরকার নেই, অনর্থক টাকা নষ্ট।"

দাদা উত্তর দিলেন. "খুব যে হিসেবী হয়েছিস্ রে, টাকা নষ্ট, কি সার্থক সে কথা তুই কি বুঝবি; রয়েছে, তাতে কি হয়েছে, তোর বৌদিদিরও তো যথেষ্ট রয়েছে তাই বলে তো নেওয়ার আগ্রহ কিছু কম দেখলুম না, তুই হলি কি রেখা, দাদাকে আজকাল পর লাগে না?" রেখা বলল, "সে কি দাদা, আপন তবে কে? তুমিই যদি পর?" এইতেই গলা ধরে এল রেখার, আর কিছু বলতে পারল না।

দাদা হেসে বললেন, "এইরে মেয়ের অমনি চোখে জল এসেছে, আচ্ছা তোর কাণ্ড দেখে দুঃখ হয় না, বল না? মেয়েদের গহনায় বিরাগ হয় নাকি আবার?"

রেখা বলল, "দাদা! সবাইকার সব জিনিষ সমান অনুরাগ হয় না, আচ্ছা—তোমার যদি খুব ইচ্ছে হয় তবে যা'হয় একটা দাও আমি নিচ্ছি। কিন্তু রয়েছে তো; মিথ্যে পড়ে থাকবে, সেখানে আমি তো ওসব পরিই না, কালে ভদ্রে যদি পরি।"

দাদা বললেন, "এবার যে দেখছি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে কিছুই চাইলি না আমার কাছে, তোর বৌদির তো নিত্য নূতন ডিজাইনের ফরমাসের জ্বালায় অস্থির হই; তোর কি নূতন ডিজাইনের চুড়ি, কি অন্য কিছু চাইনা, বলনা কি চাই?"

মিনতির সুরে রেখা বলল "দাদা, এনিয়ে ব্যস্ত হয়োনা, দরকার হলেই তোমাকেইতো বলব, এখন আমার কিছু দরকার নেই ওসব, সবই নূতন ডিজাইনের জিনিষ পড়েই আছে।"

দাদা আর কিছু বললেন না, কেমন যেন বিমর্ষ, অন্যমনস্ক হয়ে চুরুট ধরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন। আস্তে আস্তে রেখা সেখান থেকে উঠে গেল।

দুপুরে দু'টো নাগাদ সম্পর্কিত বোন দীপালী এসে ডাকল, "রেখাদি, চল ভাই বড় দালানে কাপড়ওলী এসেছে তোমাকে সকলে ডাকছে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেখাকে উঠতে হ'ল, বড় দালানে গিয়ে দেখল; সম্পর্কিত বোনেরা, ভাজেরা সব, মায় মা পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত আছেন, একটী কাপড়ওলী মুটের মাথায় করে একরাশ কাপড় এসেছে,

আর তাই সব মেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে দেখতে ও বাছতে সুরু করেছে, তাকে দেখে সেই পুরাণ চেনা কাপড়উলী বলে উঠল, "আসুন দিদিমণি আপনি শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছেন, তাই বাবু খবর পাঠিয়েছেন, ভাল ভাল কাপড় নিয়ে আসবার জন্য, এই দেখুন না সব নূতন নূতন ডিজাইনের সাড়ী, পছন্দ করে নিন, আর যা লাগে ফরমাস দিন এনে দেবো।"

নিরুৎসাহ ক্লান্ত স্বরে রেখা বলল, "আমার কাপড়ের তো দরকার নেই উপস্থিত, কেননা ঢের রয়েছে।"

একথা বলা মাত্র সব মেয়েরাই চমকে উঠল,। ঠোট উল্টে অরুণা বলে উঠল, "বাবা মেয়ের সবেতেই বিরাগ দেখান, গুমোর আর কি, সবাই সাধে কিনা বেশী করে, আমাদেরতো সাধার নেই বকুনিই লাগায়। এতসব চমৎকার চমৎকার কাপড় এসেছে, ইচ্ছে করে সব-গুলোই রাখি, যতই থাকুক "না, নেব না", বলে নাকি কেউ? এই তো বৌদির তিন আলমারি কাপড় পচ্‌ছে, দেখ দিকিন, তবু তিনি কতগুলি পছন্দ করেছেন নিজের জন্যে; তারপর তোর মা'র কাল একাদশীর উপোস গেছে, ক্লান্ত শরীর নিয়ে একটু শুয়েছিলেন, কাপড়-উলীর নাম শুনে তিনিও এসে উৎসাহ করে তোর জন্য কত কাপড় বেছে রেখেছেন দেখ দিকি, মোটে তো তুই একটা মেয়ে, ওঁর কি সাধ যায় না পাঁচখানা তুই পরিস, নিজের তো ওঁর সবই ঘুচেছে, তোদের নেড়েচেড়েই না বেঁচে থাকা, না মেয়ে একেবারেই বলে বসলেন, যে আমার চাই না, কি দিয়েই যে বিধাতা তৈরি করেছিলেন তাই, জানি না।"

চকিতে ফিরে রেখা মায়ের মুখের দিকে চাইল, কী বিবর্ণ ও শুষ্ক মুখে তিনি রেখার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, কাছে খানকয়েক অতি সুন্দর সুন্দর সাড়ী বাছা রয়েছে। মুখের ভাব তখনই রেখার বদলে গেল; মায়ের সেই স্তব্ধ পাষাণ প্রতিমার ন্যায় মূর্ত্তির কাছে রেখা বসে পড়ল ও পরম আহ্লাদের সুরে বলে উঠল, "ও তাই, সব ভাল ভালগুলোই মা একপাশে বেছে রেখেছেন, এগুলো পেলে আবার কেউ নেব না বলে নাকি, ওগুলো আমার পছন্দ হচ্ছিলনা তাই; আবার কাপড়উলি কি মনে করবে ভেবে বলছিলুম 'চাই না আমার কাপড় আছে।" তারপর কাপড়গুলো পরম আগ্রহের সঙ্গে নাড়তে নাড়তে অরুণাকে বলল, "এইসব রংয়ে আমায় খুব মানাবে না অরুণা?" কিন্তু তখনও মায়ের মুখে সন্দেহের আভাষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি রেখা দেখতে পাচ্ছিল, তাই বললে, "মা আমার আরও একখানা জর্জ্জেট চাই, আরও দু-একটা নতুন ধরণের কাপড় তোমাদের কাপড়উলীকে আনতে বলে দাও, শীঘ্র যেন আসে মা।"

এতক্ষণে মা উৎসাহের সঙ্গে মেয়ের আর কি কি চাই সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে ও আলোচনা করতে সুরু করলেন।

রেখার কাজ শেষ হ'ল, সবাই নিজ নিজ স্থানে চলে গেল বিশ্রামের জন্য। রেখা এসে নিরালা একটা ঘরে ক্লান্ত অবসন্ন ভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, তার সমস্ত পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত স্নায়ুমণ্ডলী তার কাছে যেন জানাতে লাগল, "আর পারি না, আর পারি না গো।"

বিকেলে অরুণা, বেলা, দীপালী প্রভৃতি গিয়ে রেখার মাকে বলল, "আমরা বায়স্কোপে যাচ্ছি, রেখাদি'কে নিয়ে যাব কি?"

রেখার মা বললেন, "যা' না, নিয়ে, দেখ আবার যেতে চায় কিনা, মনটা যেন তার কেমন কেমন দেখছি, জোর করে নিয়ে যাবি, যদি না যেতে চায়।"

অরুণার দল রেখার ঘরে এসে ডাকল, "উপুড় হয়ে পড়ে পড়েতো খুব ঘুমিয়ে নিচ্ছিস রেখা, এখন ওঠ, বায়স্কোপে যাবিতো শিগ্‌গির সাজ পোষাক করে নে, বিকেলের শো'তে আমরা যাচ্ছি, তোর মা তোকে ধরে নিয়ে যেতে বললেন।"

রেখা বলল, "তাই নাকি, আমার অপরাধ ?"

অরুণা বলল, "তুই নাকি মনটা কেমন খারাপ করে বসে আছিস ভাই।"

রেখা হেসে উত্তর দিল, "তোদের সবাকার আমার উপর যে গভীর মনোযোগ, তোরাই মা'কে অমন মিথ্যা খবরটা কেউ দিয়েছিস দয়া করে আরকি ?" বলেই উঠে পড়ল ও বলল, "তোরা নিজের নিজের প্রয়োজন সারগে যা, আমি ঠিক সময় প্রস্তুত থাকব। ডেকে নিয়ে যাস্।"

খানিক পরে অরুণারা প্রস্তুত হয়ে ঘরে এসে দেখল, রেখা কাপড়ে ব্রোচ আঁটছে, আজকের কেনা সব চেয়ে সুন্দর সাড়ীখানা সে পরেছে। মুগ্ধ চোখে খানিক দেখে অরুণা বলল, "তোকে ভাই ভারি সুন্দর মানিয়েছে, আর এই রংয়ে তোকে সবচেয়ে মানায়।"

রেখা বলল, "তোর চোখেতো ? ও সবেতেই তুই আমায় অপরূপ দেখিস।"

অরুণা বলল, "আচ্ছা আমার চোখে কিনা তা' দেখতে আর শুনতে

পাবে এখন, ও বাড়ির সেজদিরাও তো যাচ্ছেন, খবর পাঠিয়েছেন বলেই না আমাদের যাওয়া। জামাইবাবু সেদিন কিরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসাটা করেছিলেন, এই রংয়েরই সেই সাড়ীটা সেদিন পরেছিলে মনে নেই ?"

দীপালী বলে উঠল, "না ভাই রেখাদি, জামাইবাবু ও সুধীরবাবু দু'জনেই সেদিন বললেন, "তোমার এমন একটা সহজ শ্রী আছে, সব রংয়েই তোমায় সুন্দর মানায়, পরশু পুরান খয়ের রংয়ের ভায়লেট খানা পরেছিলেন বেড়াতে যাবার সময়; সেজদিকে জামাইবাবু সেদিনও ঐকথা বলেছিলেন, আমি শুনেছি যে পুরান কাপড়েও তোমায় সুন্দর মানায়।"

রেখার মুখটা যেন একটু বদলে গেল, হাতের ব্রোচটা আঁটা থেমে গেল, সে মুখে শুধু বললে "যা তোরা, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।"

ওরা চলে যেতে যেতে বলল, "আবার পাঁচ মিনিট কিসের ? তোমারতো হয়েই গেছে শীঘ্র এস ভাই দেরী হবে আবার।"

রেখা গাড়ীতে উঠবার সময় ওরা সব বিস্ময়ে বড় বড় চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়েই রইল শুধু রেখার দিকে, "একী-এ, কোথায় বা সেই বাহারে সাড়ী, কোথায় বা কি ! সাদা খদ্দরের সাড়ী, ব্লাউস পরিহিতা গম্ভীর মূর্ত্তি রেখা গাড়ীতে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অরুণা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, "কেনই বা মরতে তখন তোর সঙ্গে কথা বলতে গেছলুম ভাই, এতদিনেও তোকে চিনতে পারলুম না. এমনই আমি বোকা, সাধে কি আর মুকুলরা বলে তোর

মাথায় ছিট আছে, প্রকৃতিস্থ নয়; তোকে সুখ্যাতি করেছে, বলেছি বলেই কি সব খুলে এই বেশে এলি? ধন্য মেয়ে যাহোক, তাই বুঝি তখন আমাদের ঘর থেকে বিদেয় করে দিলি? বটে!"

রেখা হেসে বলল, "রাগ করিস্‌নি ভাই, ওরে সত্যি বলছি তোকে, আমি ভুলে ওটা পরেছিলুম, তাই মনে পড়ায় খুলে রেখে এলুম, বাড়িতে ফিরে ওটা আজ পরব, মা 'তাতেই বেশী খুসী হবেন'খন, জানিস তো আজ……

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অরুণা বলে উঠল, "জানি জানি সেজন্যে তো তুমি সেজে গুজে উল্টেই যাও, তুমি কিনা আমাদের মত,—ওসব মিছে কথায় আর আমায় বোঝাতে হবে না।"

রেখা উত্তর করল, "আচ্ছা একটু পরেই দেখতে পাবি. তাহলেই তো হ'ল। আজকাল অভিজাত বংশের মেয়েদের ফ্যাসানই হচ্ছে বাইরে বেরোবার সময় খদ্দর সাজে সজ্জিত হওয়া, আ-র এই শাড়ীটা কি মন্দ নাকি, কত দাম এটার জানিস"?

বিরস মুখে অরুণা বলল, "থাক জেনে কাজ নেই আর, তোমার পায়ে কোটী কোটী নমস্কার, মত প্রকাশ করার ফলে শেষে কি এই পথের মধ্যে 'বিধুর মা' দাসীর কাপড় খানাই চেয়ে নিয়ে বদলে পরবে? তোমায় বিশ্বাস কি বল, তুমি সবই করতে পার।"

রেখা হেসে বলল, "আচ্ছা উপস্থিত সব চুপ। বাড়ি গিয়ে ঝগড়া যা হয় হবে। তবে বাড়ি গিয়ে তোদের কি রকম খুসী করব সে আমার মনেই রইল।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে রেখা সত্যই, সেই শাড়ী পরে সজ্জিত

হয়ে মা'য়ের মুখে তৃপ্তির আশ্বাসের হাসি ফোটাল. কিন্তু অত সহজে দাদাকে ঠকাতে পারল না, তিনি নানা কাজে অকাজে বার বার এসে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে রেখাকে লক্ষ্য করায় রেখার অস্বস্তির অন্ত রহিল না। কিন্তু বুঝতে না পারার ভান করে ও কাজের অছিলায় দাদার দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করে রইল।

রাত্রি এগারটা, সুসজ্জিত শয়ন কক্ষের দরজায় এসে রেখা থমকে দাঁড়াল, একবার, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

বিছানায় দীনেশ বসেছিল, গম্ভীর স্বরে বলল, "এসে পর্য্যন্ত তো একবারও টিকি দেখতে পাইনি, কেন? বাড়িতে যে আছ, তা এতক্ষণে জানতে পারলুম, অথচ তোমার ভগ্নিপতিরা এলে বোনেরা ক'বার করে নানা ছলে এসে দেখা সাক্ষাৎ করে যায়, আমার তা জানতে বাকি নেই জান? আজই তো এবাড়িতে আমি নতুন ঢুকিনি"।

রেখা উত্তর দিল, "বায়স্কোপে গেছলুম আজ, সন্ধ্যায় বাড়ি ছিলুম না তো"।

দীনেশ উত্তর দিল, "এখানে এসে যে খুব মজা মারছ তা আমার জানাই আছে, তা অন্যদিন গেলেই তো হ'ত, আজ আমি আসব তা জানতে না কি?"

রেখা উত্তর করল, "কি করে আর না জানব, লিখেই যখন পাঠিয়েছ; আর আজই সবাই গেল, সুবিধা হল, আজই গেলুম। তুমি আসবে, তা বাড়িতে যথেষ্ট মানুষ আছে, তোমার খাতির

অভ্যর্থনার ত্রুটী হবে না তো, আর রাত্রে তো ফিরবই; অতএব তুমি আমার জন্য কি বাধা হতে পারে যে বায়স্কোপে যাবার তা আমি বুঝতে পারিনি।"

দীনেশ বেশ কড়াস্বরে কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল, 'বুঝতে পারবে কেন, আমি না এলেই বাঁচ কিনা, সে আমার তো জানাই আছে, বড়লোকের খাতির অভ্যর্থনার লোভে তো আসিনি, তুমি আছ বলেই আসতে হয় এখেনে। তা যাই হোক বলি সে কাপড়খানা পাওয়া গেল? মা জিজ্ঞাসা করেছেন, সেই অবধি মরছি আমি ভেবে তা কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, কাকেই বা কি করি আমি আসব তা ভ্রুক্ষেপই নেই।'

রেখা উত্তর দিল, 'কাপড় হারাল তোমাদের বাড়ীতে এখানে আমি তা পাব কি রকম?'

দীনেশ আরও চড়া গলায় বলল, 'কি বললে, অতটাকা দামের কাপড়খানা গেল, অমনি গেলই, আবার মিছে কথা আমাদের বাড়ি থেকে গেছে, বলি আমাদের বাড়িতে তোমার কাপড় কে নেবে? ওসব শুনতে চাই না, সে কাপড় চাই-ই, বুঝলে? আমার এই শেষ কথা।'

রেখা উত্তর দিল, 'যেখানা হারিয়েছে, সেখানা আর চাই বললে পাচ্ছি কোথায় বল, তবে সেই রকম একখানা এমন কি বলত না হয় দু'খানাই, দেখে শুনে নিয়ে যাব এখন, কেন না সে তো এঁদেরই দেওয়া কাপড়, কাজেই দাম দস্তুর সবই এদের জানা আছে'।

কথা বলতে বলতে, এবার হঠাৎ রেখার মনে পড়ে গেল,

এই ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই এই যে ইতরোমো কথা নিয়ে কথা কাটাকাটি স্পষ্ট স্বরে চলেছে, এ নিশ্চয়ই মা'য়ের কানে যাচ্ছে ; মা' হয়তো এখনও দালানে পায়চারি করছেন, ইচ্ছে করেই। 'নাঃ কি-ই-যে করি, আর পারিনা বাপু আমি,' মনে মনে একথা বলে, রেখা চট্ করে বিছানা থেকে নেমে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'আসছি একটু'—বলেই দোরটা খুলে দেখে, যা ভেবেছিল তাই ; মা' স্তব্ধ হয়ে রেলিঙে ঠেস দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ভাব মোটেই সুবিধের নয়। যেন মা'কে দেখতে পায়নি, এই ভাবে রেখা শব্দ করে দোরটা ভেজিয়ে রেখে, বাথরুমের কলটা গিয়ে খুলে দিল, ও সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, তার পরে মাথায় কপালে জল দিয়ে, নিজেকে সুস্থির সংযত করে, যখন ফিরল, দেখল মা' নেই। তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল রেখা, তারপর ফের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

রাত্রি দুইটা বাজিল। বিনিদ্র রেখা ধীরে খাট থেকে নেবে দাঁড়াল, মুখের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কঠিনতা নিদ্রিত দীনেশের দিকে খানিক চেয়ে থাকল, চোখ অস্বাভাবিক জ্বলছে তার ; বেরিয়ে এল ঘর থেকে নিঃশব্দে, বুকের উপর দুই হাত রেখে ধীরে ধীরে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। সুখসুপ্ত বাড়ি নিস্তব্ধ ; তিনটার ঘা বাজল, ভয়ে রেখা চমকে উঠল, নাঃ ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই, আর কতটুকু সময়ই বা আছে দিনের আলো, ও কল কোলাহলের আরম্ভ হবার ; ধীরে মা'য়ের ঘরের কপাটে এসে

মাথা রাখল রেখা, অনেকক্ষণ পরে ফিরে জানালার কাছে এসে মা'য়ের মুখ দেখবার চেষ্টা করল একবার। অন্ধকারে দেখা গেল না কিছু, শুধু ফিরে আসছে যখন রেখা, তখনই পর-পর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনা গেল, থমকে দাঁড়াল রেখা, ঐ যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও তার অভাগিনী মা বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, ও তারই জন্য নয় তো? রেখাকে চাবুক দিয়ে কে যেন সজাগ করে দিল; একী করতে চলেছে সে, সেদিন যে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল ঐ মায়ের পায়ে মাথা রেখে, কোথায় ভেসে গেল তার সে প্রতীজ্ঞা। আজ নিজের দিকটাই সে কি করে বড় করে দেখল, একি উত্তেজিত হয়েছে সে? এর ফলে এক্ষণি কী কাণ্ডই না ঘটতে পারত, এত স্বার্থান্ধ সে কি করেই হল, নিশ্চিন্ত নিদ্রা থেকে উঠে আজ মা তার কী বিভীষিকার মধ্যেই না পড়ত, হায় অকৃতজ্ঞ সন্তান, যে নিজেকে ভুলেছে শুধু তোদের মুখ চেয়ে, তার কথা মনে করে তোরা নিজেকে ভুলতে পারিস্ না কেন? একী বজ্র-শেল সেই মা'য়ের বুকে তুই আজ দিতে উদ্যত হয়েছিলি, তার পরের অবস্থাটা ভাবতে পারিস কি স্বার্থপর অকৃতজ্ঞ হতভাগিনি"! হু হু করে চোখের জলে রেখার সমস্ত মুখ বুক ভেসে গেল, সেই বারান্দায় চেয়ারে সে ভেঙে পড়ল একেবারে······তার মন ক্রমে সেই অতীতের একটী স্মরণীয় দিনে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

ছোট একখানা দোতলা বাড়ি, দুপুর বেলা; বাড়ির গৃহিণী বাসন মাজিয়া মাজিয়া দিতেছেন, একটী বালিকা বধূ সেইগুলি ধুইয়া ধুইয়া তুলিতেছে। আজ দুইদিন বাড়ির একটী মাত্র ঠিকা

ঝি কামাই করিয়াছে এবং সংবাদ পাঠাইয়াছে, তার অসুখ করিয়াছে আর দু'ই চারদিন কামাই হইবে। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরেই গৃহিণী এই গুলি সারিতেছেন, বধু তাঁহার কথামত সাহায্য করিতেছে, এমন সময় বাড়ির দরজায় ঘঁ্যাচ করিয়া আওয়াজ হইল, গাড়ি থামার। পরক্ষণেই বৈঠকখানার দরজার কাছে কাদের কথার আওয়াজ ভেসে উঠল; গৃহিণী ব্যস্ততার সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাসনের হাত ধুয়ে উঠে পড়ে বাড়ির ভিতর দিকে যেতে যেতে বধুকে ডাকলেন, "ও বৌমা চলে এস, চলে এস, কারা সব বাড়িতে আসছে, উঠ না বাপু, নাঃ কি নেকা হাবা মেয়ে, কিছু কথা বোঝে না—"বলতে বলতে ততক্ষণে বাড়ির ভিতর চলে গেছেন, নবাগতাদের কাছে কিছু অপ্রস্তুতে না পড়তে হয় তারই ব্যবস্থায়।

বধুটী এদিকে শাশুড়ীর তাড়ায় উঠে পড়েছে কিন্তু ধোবার বাসন একখানি হাতেই আছে, তাড়াতাড়ি একবার বৈঠকখানার দোরের দিকে চাইছে, একবার ভিতর বাড়ির দিকে চাইছে এবং চলে যাওয়ারই বুঝিবা উদ্যোগ করছে, এমন সময় দেখল তার বৌদিদি ও পিসিমা দু'জনেই তার সামনে, তাঁর হাতে বাসন, আর ঐ বাসনের গোছার কাছে মেয়েকে অপ্রতিভ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, বিস্মিত নেত্রে পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইলেন। তারপর সেই মূল্যবান থান গরদ পরিহিতা কবজ সংযুক্ত সোনার হার গলায় রাজার রাণীদের মতই সুন্দর চেহারা বর্ষিয়সী বিধবা, সেই অল্পবয়সী ভ্রাতুষ্পুত্র-বধুর গলা জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন,

"ওরে আমার দুখের বাছাকে বাসন মাজতে দেখার আগে মরণ কেন হ'লনারে"। ওরে হাত পা বেঁধে এর চেয়ে মেয়েটাকে হাওড়ার পোল থেকে গঙ্গার জলে কেন ফেলে দিস্‌নিরে তোরা, এর চেয়ে তাও যে ঢের ভাল ছিল, ওরে তোরা আমায় একী দেখতে নিয়ে এলিরে"—বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, এদিকে বধুটী বাড়ির ভেতর শাশুড়ীর আদেশ মত চলে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে দুহাতে তাদের জড়িয়ে ধরেছে বাসন ফেলে দিয়ে। তোমরা, কেমন করে কোত্থেকে এলে বৌদিদি ? পিসিমা"?

এদিকে বিব্রত ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ তখন পিতৃস্বসাকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত, "এ কী কাণ্ড আরম্ভ করলেন পিসিমা, এখনি যে কেউ এসে পড়ে আপনার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যাবে, তখন রেখার কি অবস্থাটা দাঁড়াবে ভাবুন একবার, এটা যে রেখার শ্বশুর বাড়ি, কোন ক্রমেই তো এ-কথাটা ভুলে গেলে চলবে না। আপনার পায়ে পড়ি পিসিমা থামুন, যা করবার বলবার, সব বাড়ি ফিরেই বলবেন করবেন।'

আমি এই জন্যেই তখুনি বলেছিলুম, "আমি একাই যাই, পিসিমা, এখনই তো রেখাকে নিয়ে ফিরব দেখবেন তাকে" তখন শুনলেন না কথা, আর এসে এই বিভ্রাট, এখন যদি এরা আপনার কাণ্ড দেখে বেঁকে দাঁড়ায়, রেখাকে না পাঠিয়ে কি করতে পারব আমরা ? একটু থামুন পিসিমা বুঝে দেখুন ; এখনই আমি ওর শাশুড়ীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে রেখাকে নিয়ে যাব, আর আমার কথা যদি না শোনেন তো আমি কিছু জানি না।"

রেখার ভ্রাতৃবধুর ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর হতে এই কথা কয়টী বাহির হ'ল।

বুঝে দেখে পিসিমা চোখের জল মুছে রেখাকে কোলে জড়িয়ে নিয়ে থমথমে ভারি মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, এমন সময় রেখার শ্বাশুড়ী এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন, "এই যে আসুন, আসুন ? কি ভাগ্য! কই কিছু খবর তো পাইনি আপনাদের আসার, তা'হলে তো আপনাদের জামাইকে আজ আপিসে যেতে বারণ করতুম, দেখতে পেতেন তাকে"। তারপর পিসিঠাকুরাণীর মুখ দেখে ব্যাপারটা অনুমানে বুঝে নিয়ে, মুখটী বিলক্ষণ গম্ভীর করে তুললেন। তাই দেখে প্রমাদ গণে বধুটী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "পিসিমার একটু কিছু সয়না, বললুম, রোদ্দুরে এস না, মাথা টাথা ধরবে, এখনি তো আনতে যাচ্ছি রেখাকে দেখবেন একটু পরেই,"। তা শুনলেন না কিছুতেই, এলেন,। আর সেই থেকেই বলছেন, "শরীর খারাপ হচ্ছে"—বলেই রেখার বড় জা'কে বললেন, ভাই একগ্লাস গঙ্গাজল খাবার ও একটা পাখা দাওত পিসিমাকে আগে সুস্থ করি। কি যে বিপদ বাধায় পিসিমা কথা না শুনে,"—বলে বুদ্ধিমতী বধু এমনতর একটা গুরুতর ব্যাপারকে অনেক হালকা করে আনলেন। পিসিমার সঙ্গে গোড়া থেকে শেষ অবধি যদিও কথাবার্ত্তা বেশ জমল না, তবু কথা কিছু কিছু হ'ল, বিশেষতঃ যখন জামাতার মাতাঠাকুরাণী পাঁচটা কথার শেষে তাঁদের মেয়ের স্বভাবের কথা বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করে বললেন, মেয়ের পিসিমাকেই লক্ষ্য করে, "যে বেয়ানকে বুঝিয়ে বলবেন ভাই, এই যে বৌমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি এক কথায়, তেমনি মেয়েকে যেন এর পর ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দেন, মেয়ে

আপনাদের সোয়ামীর ছায়া মাড়াতে চায় না, এমন মেয়ে একালে কখন দেখিনি। এমন কি ছেলেমানুষ? ওর চেয়ে ঢের ছেলেমানুষকে তো দেখেছি, কেমন ভাব, সাব। এ বৌমা আমার যেন কী, দিব্যি আছে এদিকে সবার সঙ্গেই ভাল ব্যবহার, কিন্তু সোয়ামীর ছায়া দেখলেই আলাদা মানুষ হয়ে যায়, এ তো ভাল কথা নয় ভাই? আমার ছেলে তাই, এতোদিন আর কেউ হলে স্বভাব খারাপ হয়ে যেত, এবার এসে যেন বৌমার ব্যবহার বদলে গেছে দেখতে পাচ্ছি। মা'য়ের শিক্ষা না পেলে ও কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি তো ঢের চেষ্টাই করলুম, এরপর আমাকে আপনারা দোষ দিতে পারবেন না কিন্তু বলে দিলুম।"

এ কথায় বিশেষ মনোযোগ দিয়া পিসিমা ঘাড় নাড়িলেন, অর্থাৎ বুঝাইলেন, এ কথার গুরুত্ব তিনি খুব বোঝেন। তারপর রেখার দিকে চেয়ে বললেন, "চল আগে তারপর তোমায় আমি বুঝাব, গিয়েই মা'কে তোমার আগেই তোমার গুণের কথা বলে দেব তখন কি হয় দেখো"

পিসিমার এ কথায় একবারে বালিকা রেখার মুখটী ভয়ে শুকিয়ে গেল, পরক্ষণেই উৎফুল্ল অন্তরে ভাবল, "বাবা, আগে মা'কে দেখি গিয়ে, তারপর মা'য়ের বকুনির ভয়। আজ কতদিন হ'ল মা'কে দেখিনি 'যে, ছয় মাস সে-কী কম? ভাগ্যে না লিলির বিয়েটা লাগল, তাইতো নিতে এল; না হলে আরো কতদিন এরা ধরে রেখে দিত কে জানে।

রেখার ভ্রাতৃবধূ ও পিসিমা বিবাহপোলক্ষে রেখার শ্বশুর বাড়িতে

নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন ও আজই রেখাকে নিয়ে যাচ্ছেন, কারণ, এরা চট্ করে রেখাকে পাঠাইতে চায় না, পরে মত বদলে যাবে কি জানি, তাই আজই মিষ্ট কথায় রেখার খাশুড়ীর কাছ থেকে নিয়ে যাবার জন্যই এদের আসা।

যা হোক উদ্দেশ্য সফল হ'ল, রেখাকে এঁরা পাঠালেন, একমাসের কড়ারে সুশিক্ষা দেওয়ার সর্ত্ত করিয়ে।

উৎফুল্ল মনে রেখা বাপের বাড়ি চলল, গাড়ি থেকে নামতে তর সয় না, রেখা বাড়ির ভেতরে ছুটল।

বাড়িতে ঢুকেই পিসিমা একতলার দালানেই শুয়ে পড়ে একবাড়ি কুটুম্ব সাক্ষাতের সামনেই মড়া কান্না জুড়লেন। "ওরে বাবারে আমার স্বর্ণ প্রতিমাকে কে একেবারে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে রে বাবা, আমি এ পোড়া দু'টো চোখ দিয়ে কি দেখে এলুম রে বাবা।" ইত্যাদি।

সবাই অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করে ঘিরে দাঁড়াল, বুদ্ধিমতী বধূ সবাইকে বলল, "রেখার একটী সুন্দরী ননদ জলে ডুবে মরেছে কি না। সে-সব কথা শুনে পিসিমা সেখানেও কেঁদে ভাসিয়েছেন, আবার এখানে এসেও শোক উথলেছে, পিসিমার মাথা গরমের ধাত আপনারা আর কি বুঝবেন, ওর কাছ থেকে সরে যান সব, উনি নিজেই আবার শান্ত হবেন।"

কাঁদতে কাঁদতেই পিসিমা বৌয়ের অদ্ভুত রচা কথাগুলি শুনতে পেলেন এবং কারণটাও বুঝতে পারলেন, অতএব কান্নাটা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়ে অতঃপর তিনি আপনিই উঠে বসে চোখ মুছলেন,

তারপর কল ধরে ঢুকলেন গাড়ির কাপড় কেচে শুদ্ধ হবার জন্য।

সারাদিনটাই তাঁর থমথমে ভাব কাটল, রাত্রি এগারটার পর তিনি এসে যেখানে রেখার মা শোবার ঘরের মেঝেয় খেতে বসেছেন, সেখানে এসে গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বসলেন, ও জিজ্ঞাসা করলেন, বৌ, রেখা কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

রেখার মা উত্তর দিলেন, "কি জানি শুয়েছে তো খানিকক্ষণ।" বলে অদূরে খাটের বিছানায় যেখানে রেখা ভাই বোনদের সঙ্গে শুয়ে আছে, সেদিকে চেয়ে দেখলেন।

তখন রেখার পিসিমা সকালের সমস্ত ঘটনা সালঙ্কারে ভ্রাতৃ বধূর নিকট বর্ণনা করলেন; বিস্তর কান্নাকাটি দুঃখ শোক ইত্যাদি করার পর, উপসংহারে রেখার শাশুড়ী বলে পাঠানো সব কথা, যার সুশিক্ষা দেওয়ার সর্ত্তে একমাসের জন্য মা'য়ের কাছে পাঠান, ইত্যাদি বর্ণনা করে, মন্তব্য প্রকাশ করলেন, "শুনে আমি তো তাই বসে পড়েছি একেবারে! কি তোমার পোড়া কপাল গো, তুই হিঁদুর মেয়ে, তোর প্রাণে ভয় নেই, এতবড় আস্পর্দ্ধা যে সোয়ামীকে হেনস্থা করিস্, তারা যদি এক্ষুণি ছেলের আবার একটা বিয়ে দেয় কি করতে পারিস্ তুই ? তারা তো সেই ইঙ্গিতই দিলে আমায়, আমি কত বুঝিয়ে মিনতি করে এলুম ; "যে ছেলেমানুষ এখনও জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি" তা কি শোনে, বলেছে "এই একমাসের ভেতর ভাল করে বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে দেবেন তো দিন, নইলে আমাদের দোষ নেই কিন্তু।"

তারপর কেঁদে উঠে বললেন, "এবাড়ির মেয়ে সেখানে পড়বার

কথা নয় তা যেমন কপাল করে এসেছেন, বলে "ভাত-ঘর দেখে দিলে কাঠঘর হয়, কাঠঘর দেখে দিলে ভাত-ঘর হয়" যাই হোক তোমার মেয়েকে ভাল করে বিপদটা বুঝিয়ে দিয়ে শিক্ষা দিয়ে দাও যেন এমন কথা আর কখন আমাদের শুনতে না হয়।"

আড়ষ্ট কাঠের মূর্ত্তিবৎ বধূর বাক্‌শক্তি বোধ হয় রহিত হয়ে গিয়েছিল, তাই ননদিনীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কেবল মাত্র একবার ঘাড়টা নড়ল, মানে যে "হাঁ শিক্ষা দিয়ে দেব"।

এদিকে সমস্ত দিন আমোদেমত্ত রেখার মনেই ছিল না এই ভয়ের কথাটা। এখন ব্যাপার দেখে শুনে সে ভয়ে কাট হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল, তারপর সে একটু মাথা তুলে মা'য়ের মুখের ভাব দেখে নিয়ে কম্পিত কলেবরে মনে মনে পিসিমার মুণ্ডপাত করতে করতে বিছানায় পড়ে রইল। এদিকে পিসিমা চলে গেলেন, রেখা চুপ করে অপেক্ষা করে আছে কতক্ষণে মা'তাকে ডাকেন, কতক্ষণে মা'য়ের কাছে জবাবদিহী করতে হয় তার, মা' নিশ্চয়ই জানেন সে এখনও ঘুমায় নি, এই মাত্র মায়ের সঙ্গে গল্প করছিল ও, কিন্তু মা তো কিছু বললেনই না, উপরন্তু আজ মা'য়ের খেতেও বড্ড দেরীই হচ্ছে যে, খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় এসে মা'তাকে বকবেন হয় তো, এমনি ভাবতে ভাবতে অপেক্ষা করতে করতে কখনও ঘুমিয়ে পড়েছে মনে নেই। কতরাত্রে জানি না—ঘুমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল, অতি উৎকণ্ঠিত মনে ঘুমিয়ে ছিল, সুনিদ্রা হয় কখনো? তার সব কথা মনে পড়ল, ভাবল পিসিমা চলে যাবার পর সে জেগে আছে জেনেও মা' তো কই তাকে কিছু

জিজ্ঞেসা করলেন মা। এমন সময় শুনতে পেল, মা' তার খাটের ওদিকে পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে, রেখা চমকে উঠল, "মা' কাঁদছে কেন? উঃ কী সে কান্না, না সহ্য যায় না মা'য়ের অমন কান্না, চোখের জলে রেখার বুক বালিশ সব ভিজে উঠল, তবু মা'কে ডাকল না, বা সাড়া দিল না, লজ্জায় ঘৃণায় তার মাথা কাটা যাচ্ছিল, উঃ কত ব্যথা পেয়েই না মা, এমন লুকিয়ে লুকিয়ে বুক ফাটা কান্না কাঁদছেন, তার জন্যই নিশ্চয়, পিসিমা ঐ সব কথা বলে যাবার পর থেকেই মা' যেন কেমন একরকম হয়ে গেছলেন, সে তো বিছানায় বসে বসে তা দেখেই ছিল, তবু তাকে কই কিছুই বললেন না, নিজেই কেঁদে কেঁদে অস্থির হচ্ছেন, এই কাজে তবে তো মা' তার ব্যথার দিকটাই দেখতে পেয়েছেন, তাকে বকবার কিছু পাননি বলেই না বকেননি, ছিঃ ছিঃ কি করেছি আমি, আমারই জন্য আজ মায়ের এই যন্ত্রণা।"

কতক্ষণ পরে কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে রেখার মা ঘুমিয়ে গেলেন, জানালা দিয়ে মা'য়ের স্নেহের মত স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারা এসে রেখার মা'য়ের ব্যথা-কাতর করুণ সুন্দর মুখ অপূর্ব্ব ভাবময় করে তুলেছিল, রেখা বিছানায় বসে বসে সেই দিকে অনিমিষে তাকিয়ে থাকল, আর তার চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল; বহুক্ষণ কান্নার পর সুস্থ হয়ে রেখা সরে এসে ঘুমন্ত মা'য়ের পায়ে মাথা রেখে মনে মনে বলতে লাগল, মা' মা' আমায় এবারটির মত ক্ষমা কর মা। আর কখন জীবনে তোমায় আমার জন্য এমন কষ্ট পেতে হবে না, চোখের জল ফেলতে হবে না মা; এইবারটির মত

শুধু তুমি আমায় ক্ষমা কর মাগো ? তোমার বুক ভেঙে দেবার জন্যই কি আমার মত হতভাগ্য সন্তানের জন্ম হয়েছিল ? মা এই তোমার পায়ে মাথা রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার জন্য তোমার কখন কিছু শুনতে হবে না আর।"

কোথায় ভেসে গেল তার সেই প্রতিজ্ঞা, এত: হীন স্বার্থপর রেখা কি করেই হ'ল! মায়ের ব্যথা মনে করে সব কিছু সহ্য করতে কেন সে পারবে না ? কান্নার অতল সাগরে তলিয়ে রেখা সেই চেয়ারেই মূর্চ্ছাবৎ পড়ে রইল। ভোরে চাকরদের কাজের শব্দে সচেতন হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

অভিমানিনী

চৈত্র পূর্ণিমা, আকাশে চাঁদ হাসছে, সেই মধুর হাসি পৃথিবীরও বুক ভরিয়েছে, কেহ সে হাসি অশ্রুজলের ঢেউয়ের তলে তলিয়ে উপভোগ করছে, কেহ বা আনন্দের বন্যায় স্নাত হয়ে হাসি দিয়ে সেই হাসি উপভোগ করছে। চাঁদের হাসি, বসন্তের সমীরণ প্রভৃতি যা কিছু, প্রতিটী জীবের প্রাণের পরম দেবতার সম্পদ, তাতে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার, তাঁর করুণার দান, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষের মস্তকে সমান ধারায় বর্ষিত হয়। যার যেমন প্রাক্তন, যার যেমন কর্ম্মফল, সেই ভাবে সে তাই উপভোগ করে, তার জন্য তো তিনি দায়িক নন।

এই মধুর সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গার ধারের বারান্দায় পাশাপাশি দু'খানা আরাম কেদারা পাতিয়া স্বামী-স্ত্রী সতীরাণী, ও শচীন্দ্র, পাশাপাশি বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া কোন্ স্বপ্নালোকে ভাসিয়া চলিয়াছে। দু'জনের হাতে হাত বাঁধা।

অনেকক্ষণ পরে সতীরাণী শচীন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিল।

শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, 'কি' ?

সতীরাণী উত্তর দিল, 'সুন্দর'।

শচীন্দ্র বলল, 'চাঁদ' ?

সতীরাণী উত্তর করল, 'আকাশের, আর পাশের, দুই চাঁদই অপূর্ব্ব সুন্দর'।

হাসিমুখে শচীন্দ্র বলল, 'পাশেরটী তো কেবল মাত্র তোমার চোখে'?

সতীরাণী উত্তর দিল, "না গো, সত্যি, আকাশের চাঁদের মুখের সঙ্গে পাশের চাঁদের মুখের আদল আসে, তাই এতক্ষণ তো দেখছিলুম মিলিয়ে।" বলার সঙ্গে সঙ্গে সুমিষ্ট গলায় গুণগুণ স্বরে গেয়ে উঠল—

'চৈতি চাঁদ ওগো তুমি কইতে পার কি?
তোমার মুখে কাহার মুখের আদল দেখেছি।'

শচীন্দ্র হেসে উঠে বলল, 'ওরে বাবা, এখনই মুখে মুখে গান রচনা হয়ে গেল পর্য্যন্ত, তা ভালই হয়েছে; যদিই কোনদিন পাশেরটীর অভাব ঘটে, তখন আকাশেরটী নিয়েই সে অভাব মেটাতে পারবে।'

সতীরাণী বলল, 'উঁহু, পাশেরটী না থাকলে আকাশেরটিকে সহ্য করাই দায়, তখন ওর ঐ সুধা-হাসির সঙ্গে আমার অশ্রুরাশি মিশে সে একটী অপূর্ব্ব 'চীজ' তৈরি হবে, পাশেরটীর জন্যই না আকাশেরটী এত মিষ্টি।'

শচীন্দ্র ওর হাতে অল্প একটু চাপ দিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ রাণী, প্রকৃতির সব কিছু সম্পদ আমার মিষ্টি লাগে, যখন প্রিয় থাকে পাশে, আর না হ'লে বেদনাদায়ক। কিন্তু যে কোন দিক দিয়েই এসব অনুভব না করে আমরা তো বাঁচতে পারি না।'

সতীরাণী বলল, 'দেখ, মা চিঠি লিখেছেন এবার গিয়ে আমার কিছুদিন থাকতে হবে সেখানে, তিনি আর কি নিয়ে থাকবেন, আমি ছাড়া আর তো একটী নেই তাঁর, বাবা গিয়ে পর্য্যন্ত তাঁর

অতবড় পুরীতে একলা দিন কাটান ভার হয়েছে, যতই না অন্য আত্মীয় স্বজন থাক, মেয়েদের স্বামী, সন্তান, দু'টার একটাও কাছে না থাকলে বাঁচা অসাধ্য, কিন্তু আমি যে এদিকে তোমায় ছেড়ে একদিনও থাকতে পারি না, আমি যাই কি করে বলত? আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, ছোট্ট খোকাটী তো হয়েছে, মা'কে বলে কয়ে বাণীকে মায়ের কাছে রাখলে কেমন হয়? পারবে না মা'কে রাজি করতে?'

শচীন্দ্র বললে, তা'না' হয় পারলুম, কিন্তু ঐ ছোট্ট তিন চার বছরের মেয়ে থাকতে পারবে কি আমাদের ছেড়ে।'

সতীরাণী বলল, 'তা দু'একদিন যদি কেমন কেমন লাগে, না'হলে মা'য়ের যত্ন পেলে আমাদের ভুলে যাবে দেখো; মা'য়েরও তো একটা অবলম্বন চাই আমার, বিশেষতঃ খোকাটা হয়ে পর্য্যন্ত, ও যেন মনমরা হয়েই সর্ব্বক্ষণ থাকে, আমার কাছে ততখানি আমোল না পাওয়াই ওর এই মনঃক্ষুন্নতার কারণ। অন্ধের নড়ীর মতই মা'য়ের প্রাণ ভরা আদর যত্নই বরং এসময় ওকে বাঁচিয়ে দেবে, তা'হলেও কিন্তু দু'এক দিনও তো আমার যাওয়া উচিত, অত ক'রে লিখেছেন, মায়ের কথাটাও তো ভাবতে হয় আমার, সেখানে গিয়ে বাণীকে রেখে চলে আসব এবার। মা'কে দেখতেও বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু কী-ই যে আমার হয়েছে, এক মুহূর্ত্ত তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না, এই দু'একদিন যে কি করে কাটবে তাই ভাবছি।'

শচীন্দ্র বলল, আমার অবস্থাও ভেবেচ। আচ্ছা রাণী, যদি

সত্যিই কখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়, তবে কি হবে আমাদের ?"

সতীরাণী উত্তর দিল, 'তা' কি করে হবে গো! বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়ে আমার কোষ্ঠি প্রস্তুত হয়েছে, আমি 'এয়োস্ত্রী' মরব। তবে আর এ জগতে আমাদের ছাড়াছাড়ি কোথায়? বিয়ে হয়ে পর্যন্ত একটা দিন তোমায় ছেড়ে থাকি না, এই নিয়ে সঙ্গিনীরা কত ঠাট্টা তামাসা করে আমায়, তা সত্য ভেবেই চুপ করে থাকি আমি। গতবারে তো সবাই তীর্থ করতে গেল, খোকাও হয় নি, বাণীও বড় হয়েছিল, তোমার ছুটি নেই যেতে পারবে না বললে, তাই আমিও গেলুম না; কি জানি ঠাকুর দেবতার স্থান, সেখানে গিয়ে তোমার জন্তে ছটফট করে মরব, তাঁদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারব না, আর তাঁরা অন্তর্যামী, কুপিত হবেন; কাজ কি অমন লোকদেখান পুণ্য ধর্ম্মে। ওঁরা আমাদের মনটা জানেন বলেই না, কেমন আমাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন, কঠোর তপস্যা, যাগ, যজ্ঞ, প্রভৃতি তোমাদের ভাগে, তবে তোমরা তাঁকে পাবে। আর আমাদের বেলা স্বর্গের শ্রেষ্ঠ আসন নির্দ্দিষ্ট থাকবে শুধু সতী স্ত্রীলোকের জন্য। স্বামীকে ভালবাসলেই তাঁকে ভালবাসা হল, স্বামী প্রেমের ভিতর দিয়েই তিনি আমাদের পূজা গ্রহণ করেন। কী সুন্দর আমাদের প্রতি তাঁর অপূর্ব্ব করুণা, কী সহজ-সাধ্য মনোরম পথে আমরা তাঁকে পেতে পারি, এসব ভাবলে জ্ঞানহারা হয়ে যেতে হয়, জান তো শাস্ত্রোপদেশ? 'নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞ'—

শচীন্দ্র সতীরাণীর মুখে হাত চাপা দিয়ে চেপে ধরে বললেন,

রক্ষে কর, আর 'শাস্ত্রের বচন আউড়িও না, যখন যেমন মেজাজ থাকে আর কি, কখন বলেন, 'শাস্ত্র তোমরা 'নিজের কোলেই ঝোল' টেনে তৈরি করেছ, ওতে আমাদের প্রতি সব কিছু অবিচার আছে,' আবার কখন ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে শ্লোক আউড়ে প্রমাণ করছেন, 'আহা তোমরা কি কথাই না বলেছ, ঠিক আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিলে যায়'। ওকথা থাক, যে কথা হচ্ছিল তারই আগে নিষ্পত্তি হোক্ ; আচ্ছা ধর, এ জন্মেই না হয় আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না, কিন্তু যদি আসছে জন্মে হয় ?"

সতীরাণী হেসে উঠল, 'তুমি কি গো, শেষ পর্য্যন্ত ছাড়াছাড়ি করবার চেষ্টায়ই আছ দেখছি, তা আসছে জন্মেই বা হবে কেন শুনি, কী পাপ আমি করেছি, তাই ঐ শাস্তি হবে ?'

শচীন্দ্র হেসে উত্তর দিলেন, পাপ করলেই কি আর হয় গো, ও ভগবানের একটা পরীক্ষা, কী কর তুমি তখন তাই দেখবার জন্যে ঐ ব্যবস্থা হবে আর কি। এই স্বয়ং বিষ্ণুর লক্ষ্মীকেও তো ঐ রকম বিপাকে পড়তে হয়েছিল, তিনি তো আর পাপ করেন নি কিছু, তবু তাঁকে অপরের স্ত্রী হয়ে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ করে কেঁদে কেঁদে জীবন কাটাতে হয়েছে ও কলঙ্কের পশরা মাথায় চাপাতে হয়েছে ; তবে ?"

সতীরাণী মুখটী শুকিয়ে একটু সরে এসে শচীন্দ্রের হাত জোরে চেপে ধরল, 'ওমা তাই তো এসব কি সর্ব্বনেশে কথা বলছ তুমি, এও হতে পারে নাকি কখন, তা হলে আমি যে একদিন, একমিনিট, একপলেকেওও বাঁচতে পারব না গো ! কে' না কে, তার স্ত্রী সেজে

ঘর-সংসার করা আমার দ্বারা হবে না বাপু, তুমি যেখানেই থাক না, তখন খুঁজে পেতে এসে আমায় উদ্ধার করো কিন্তু, নইলে আমি কি করি সে দেখতেই পাবে তখন।'

হো' হো' করে শচীন্দ্র হেসে উঠলেন, 'উদ্ধার করতে গেলে তুমি আর তোমার আত্মীয়স্বজন তখন চ্যালা লাঠি নিয়ে আমায় তেড়ে আসবে না তো? তখন আমিতো আর 'কৃষ্ট'ঠাকুরটীর মত মূর্ত্তি ধরতে পারব না, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে।'

অগত্যা সতীরাণী বিমর্ষ মুখে আকাশ পাতাল ভাবতে আরম্ভ করে দিলেন যে, সেই অবস্থায় পড়লে তখন কর্ত্তব্য কি?

আর শচীন্দ্র মিটিমিটি দুষ্ট হাসি হেসে কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাই তো সে কী ভয়ানক অবস্থা, আমার তো ভাবতে গেলে এখনই হার্টফেল হবার যোগাড় হচ্ছে; দেহটা তো কিছুই নয়, আত্মার সঙ্গে যে আত্মার মিলন, তারই নাম প্রকৃত 'ভালবাসা'। সেই 'যুগ্মাত্মার' বিচ্ছেদ হওয়া কি একটা সাধারণ কথা! ভাগ্যে আমার আজ এ কথা মাথায় এল, তাই তো এখনই একটা মীমাংসার চেষ্টা দেখছি, কিন্তু দেখ একটা কথা—এই সম্ভাবনাটা তো আর এ-জন্মে নেই, এটা আসছে জন্মের ব্যাপার; তা মনে যখন পড়েছে, মতলব তখন একটা করাই যাবে, এখন ঢের তো সময় আছে; এই আজই তো সমস্ত রাতটাই রয়েছে, ফন্দি একটা বার করবই। উপস্থিত উঠে পড়া যাক এস, রাত অনেকটাই হল, বেশী রাত্রে খেতে গেলে মা আবার বকাবকি করবেন। ছোট খোকাটারও দুধ খাবার সময় হল, চল এবার যাই।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সতীরাণী বলল, হাঁ চল যাই, এজন্মে কার সাধ্য আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায় (অলক্ষ্যে বিধাতা পুরুষ একটু হাসলেন)। আসছে জন্মের কথা আসছে জন্মে হবে, তোমার যতসব মনগড়া বিশ্রী কল্পা।' বলে উঠে পড়ল।

এরপর মাত্র তিনবৎসর অতিবাহিত হয়েছে, আমাদের আখ্যায়িকার পতিসোহাগিনী আদরিণী সতীরাণীর মাথার উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা দুর্যোগ গেছে। তার ছোট্ট খোকাটী দু'দিনের অসুখে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেছে। শচীন্দ্রের শত সান্ত্বনা-বাক্যও তাকে অটুট রাখতে পারেনি। সে শয্যাশায়ী হয়ে ছিল। কঠিন রোগে যমে মানুষে টানাটানি চলল। পেটে একটী সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছিল, এই ধাক্কায় সেটীও অকালে ঝরে গেল। অবশেষে মানুষ জয়লাভ করল, যম ফিরে যেতে বাধ্য হল; কিন্তু একদিন শচীন্দ্রের মা'য়ের উচ্ছ্বসিত কান্নায় আত্মীয়েরা জানতে পারল, যে বড় বড় ডাক্তারেরা বলে গেছেন, 'এই বৌয়ের ছেলে পুলে আর কখন হবে না।' এই ফুলের মত নাতিটীর বিয়োগ দুঃখ শচীন্দ্রের মা'য়ের যতটা না লাগল, বৌয়ের সম্বন্ধে এই খবর তাঁকে ততোধিক কাতর করল। 'ও বৌয়ের আর কি প্রয়োজন? অত রাজার হালে ডাক্তার ঔষধ পথ্য দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে আর কি-ই লাভ হবে? একটা মাত্র মেয়ে, সেও আবার দিদিমার অগাধ ঐশ্বর্য্যের অওতায় মানুষ হচ্ছে; ছেলেটাও অকালে গেল, বৌও থেকে নেই, এ কেউ সহ্য করতে পারে কখন? এই তো এক সন্তান, এর ছেলে পুলে পাঁচটা না হ'লে মানায় কখন? আর পিতৃ-পুরুষের

ব্যবস্থা বা কি হবে? এত অগাধ ঐশ্বর্য্যই বা কে ভোগ করবে? দিন রাত শচীন্দ্রের মা হা' হুতাশ, কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন। এমন কি একদিন ছেলেকে বলেই বসলেন, 'এরকম ক্ষেত্রে তোমার আবার বিয়ে করতে হবে কিন্তু বাবা'। ছেলে গম্ভীর মুখেই উত্তর দিল, 'মা এমন ধারা করলে ওকে আর বিছানা থেকে তুলতে পারব না। সবে জীবনের আশা হয়েছে, এসময় যদি কোনরকমে এসব কথা কানে যায়, ওকে খুন করা হবে। মা আর কিছু বলেন না, সময়ের জন্য তাঁর মনের কথা মনেই রাখলেন।

সতীরাণী শচীন্দ্রের প্রাণঢালা যত্নে ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে আসতে লাগল কিন্তু শাশুড়ীর মন মেজাজের পরিবর্ত্তন তাকে যেন অগ্র আঘাত দিল। দেখেশুনে শচীন্দ্র বলল, 'রাণী চল, আমরা দিনকতক ঘুরে আসি, তোমারও চেঞ্জ দরকার, আমারও বাড়িতে আর ভাল লাগছে না। সতীরাণী বলল, মা'ও যাবেন তো? শচীন্দ্র বলল, 'না; তাহ'লে বাড়িতে কে থাকবে? শুধু আমরা দুজনে চল বেড়িয়ে আসি আত্মীয় বন্ধু বান্ধব'ও পরিচিত কাউকে আমাদের দরকার নেই।

সতীরাণী স্বামীর মুখ চেয়ে নিজের ব্যথা চাপা দিয়ে যাবার আয়োজনে মাতল।

তারপর প্রায় বছর ঘুরিয়ে নানা দেশ বেড়িয়ে সতীরাণী ও শচীন্দ্র বাড়ি ফিরলেন, দুজনেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, মুখের সেই মধুর হাসি ফিরে এসেছে, দু'চোখে সেই চক্ষের হারাই ভাব, মলিনতার লেশমাত্র সে মুখে নেই। বাড়ি ফিরে শচীন্দ্র সতীরাণী

তাদের একমাত্র কন্যা সন্তান বাণীকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন, সতীরাণীও মা'কে দেখতে উৎসুক, কাজেই দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে সেখানে দিন কতক কাটিয়ে এলেন। দু'জনের সুখের মাত্রা যেন ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে পড়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থেকেও দু'জনের পরস্পরের প্রতি আসক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি, সদাই একটা হারাই হারাই ভাব, সতীরাণীর সুধাকণ্ঠে গান,

'নয়ন না' তিরপিত ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।'

শুনতে শুনতে শচীন্দ্র যেন স্বর্গ সুখ অনুভব করত। ওদের আর ছেলে পুলে হবার সম্ভাবনা নেই, এ কথায় শচীন্দ্রকে একটু দুঃখিত করতে পারেনি, বরং সতীরাণীকে আর দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না কখন, ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। 'এই তো সন্তান তার সঙ্গে শত্রুতা করে রাণীকে কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ করেছিল, তা ছাড়া হ'লেও থাকার যখন নিশ্চয়তা নেই। ফুলের মত সুন্দর খোকাটী তাদের সুখ স্বপন সম তপ্ত বুকে যে স্মৃতি রেখাটী টেনে গেছে সে তো আর মুছবার নয় কোনদিন। কাজ নেই আর সন্তানে, বাণী বেঁচে থাক, সেই তাদের সব অভাব মেটাবে।' ভেবে শচীন্দ্র বেশ একরকম মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে এবং সেই পূর্ব্বেরই মত পূর্ণ উৎসাহে বাহিরের নানা কাজে মেতে গেল। শচীন্দ্র রূপে গুণে অদ্বিতীয় ছিল, তার উপর অর্থশালী; কাজেই তার বন্ধু, বান্ধব, স্তাবক, বিস্তর ছিল, দেশের দশের সবকাজেই চিরকাল শচীন্দ্র

অগ্রণী ছিল, দেশ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেও ঠিক সেই ভাবে নিযুক্ত করল নিজেকে।

দিন কয়েক পরে শচীন্দ্রের মা বললেন, 'শচী এইবার মাসখানেকের জন্য আমায় নিয়ে তোমার বেরুতে হবে, আমার সই, মহাপ্রসাদ সব যাবে, তীর্থ সেরে গয়াটাও অমনি করে আসবি তুই। আর দেরী করা ভাল দেখায় না, গয়া এতদিন সারাই তোমার উচিত ছিল বাবা! তা ছাড়া বুড়ো হয়েছি, কখন আছি কখন নেই, এবারকার সুযোগ আর ছাড়া হবে না এত যখন সঙ্গী পেয়েছি।'

শচীন্দ্র ম্লান মুখে এসে সতীরাণীকে মা'য়ের আদেশ জানাল, সতীরাণী যেন চমকে উঠল, বলল, 'কেমন যেন কয়দিন থেকে আমার মন বলছে, তোমায় আমায় এবার ছাড়াছাড়ি হবে, এক মাস, ওঃ কি করেই থাকব আমি একা এই বাড়ীতে।'

শচীন্দ্র বলল, 'তুমিও চল রাণী, আমারও কেমন মন চাইছে না একলা যেতে, মা'কে বলে আমি মত করাচ্ছি দাঁড়াও।'

কিন্তু মত শেষ পর্য্যন্ত করাতে পারল না কোনমতে। মা' বললেন, 'পাগল, আমি কোথায় এই বাড়িঘর বৌয়ের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাব, 'ও' শুদ্ধ কোথা যাবে? এই তো সেদিন অত বেড়িয়ে এল, তখন কি আমি গেছলুম নাকি? আর তোরও কোন পদার্থ নেই বৌ যা বলবে তাতেই নাচবি।'

শচীন্দ্র লজ্জা পেয়ে বলল 'না এই জিজ্ঞেস করছিলুম তোমায় যদি মত না থাকে, যাবে না এখানেই থাকবে তার আর কি।'

মা' বললেন, 'হাঁ পরশু আমরা বেরুচ্ছি তুমি প্রস্তুত হও।'

এদিকে নিজের ঘরে এসে অবসন্ন ভাবে শুয়ে পড়ল শচীন্দ্র ; সতীরাণী জোর করে মুখে হাসি এনে সান্ত্বনা দিল, ছিঃ ছিঃ কি বৌ পাগলা গো তুমি, লোকে শুনলে বলবে কি, মা আমার যাবার মত করেন নি, তাই একেবারে ছেলেমানুষী আরম্ভ করলে, দেখ তো আমাকে, আমি তো দিব্যি আছি, শচীন্দ্র চেয়ে দেখল, সতীরাণী চোখের জল গোপন করবার জন্যে মুখ ফেরাল, ম্লান হেসে শচীন্দ্র বলল, 'না ছেলে মানুষী করব কেন, একটা মাস এই তো নয়, এ দেখতে দেখতে কেটে যাবে, কি বল রাণী ! তুমি যখন ছেলে মানুষী না' করে দিব্যি আছ আমার করা সাজে ?' দু'জনের দিকে চেয়ে দু'জনেই হেসে উঠল, চোখে জল, মুখে হাসি। তারপর দুইটা মাত্র রাত্রি তাদের একসঙ্গে কেটে ছিল, সে যে কি করে, তার বর্ণনা করতে লেখনী আমার অশক্ত, এরকম দম্পতি যদি কেউ থাকেন এই পৃথিবীর বুকে তাঁরাই শুধু অনুভব করতে পারবেন, তাদের অবস্থা।

শচীন্দ্র চলে গেল, বিধিলিপি সফল করতে। যাবার সময় বলল, দেখ, রাণী কবিরা বলেন, বিরহ জিনিষটা নাকি মিলনের চেয়েও মহান্, যুগে যুগে কবিরা তার অপরূপ মাধুর্য্য বর্ণনা করে গেছেন, এটা যে কি জিনিষ এবার আমরা ভাল করেই তা বুঝতে জানতে পারব। আর প্রতিদিন অন্ততঃ দুখানা করে তোমার হস্তাক্ষর আমার কাছে যেন পৌছে, সকালে একখানা, আর বিকালে একখানা, পারবে না রাণী ?

সতীরাণীর অতিকষ্টে আনা ধৈর্য্যের এবার বাঁধ ভেঙ্গে গেল,

সে বলল 'ওগো লোকে হাসবে তাই, না হলে আমি সমস্ত দিনই বসে তোমায় চিঠি লিখতে পারি, একি তুমি জান না তাই জিজ্ঞেস করছ ?' বলতে বলতেই চোখের জলে অন্ধকার দেখল সয় । 'আর তুমি ? তুমি ক'খানা লিখবে গো, ভুলে যাবে না তো ?' বলল ?

শচীন্দ্র বলল, 'আমার কাজ দেখতেই পাবে এখন, লোকের হাসিকে অমন মেয়েদের মত আমরা গ্রাহ্য করি না ।'

দিন কাটতেই হবে, সে কারু মুখ চেয়ে বসে থাকে না, কাজেই সতীরাণীরও কেটে যাচ্ছে দিন, তবে এই একমাসে ওরা যত লিখেছে তা দিয়ে বহু নভেল তৈরি হয়ে যেত। কাল ওঁরা ফিরবেন বলে টেলিগ্রাম এসেছে, সতীরাণী নিজের শয়ন ঘর দশবারই সাজাচ্ছে গুছাচ্ছে, নিজের পোষাক পরিচ্ছদ, শচীন্দ্রের শত প্রয়োজনীয় সখের ভালবাসার জিনিষ কিনে কেটে স্তূপ করছে, আর মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখছে, আজ যদি 'ও' পারত তবে আজই 'কাল' ডেকে নিয়ে আসত, কিন্তু ইদানীং শচীন্দ্রের চিঠিগুলি রীতিমতই দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছে যে, কেনই যে সব অমন বিদখুটে কথা বলে আমার মন খারাপ করে দেয়। নাঃ পাঁচ ছ'খানা চিঠিই ঐরকম হেঁয়ালীর কথায় ভর্ত্তি, আচ্ছা আসুক তো আগে তারপর দেখছি ওরকম কথা লিখে মজা করার কি ফল হয়। আঃ আজ তো আর রাত্রে ঘুম তো হবেই না, তার চেয়ে চিঠিগুলো বসে বসে পড়া যাক, আর তো কয় ঘণ্টা মাত্র, সকাল আটটা ন'টার মধ্যেই এসে পড়বে সব, হে মা দুর্গা, হে মা কালী, আমি বুক চিরে রক্ত দেব, তোমাদের পূজা দেব মা প্রাণ ভরে, ভালয় ভালয় সব বাড়িতে

পৌঁছে দাও মা, অন্তর্যামীনি, তোমার আমার মন তো দেখছ মা, এ যে তোমাদেরই দান জননী।" ভক্তি ভরে মনে মনে দেবীদের স্তব করে প্রার্থনা করে চিঠির গোছা নিয়ে আলোটা উজ্জল করে দিয়ে সতীরাণী এসে বিছানায় বসল। তারপর ক্রমাগতই চোখের জল পুঁছে পুঁছে চোখ ফুলে গেল, চিঠি পড়তে পড়তে, 'দেখ দিকিন মানুষ এমন কোথাও নাকি লেখে?' 'আমি যত দোষই না করি না কেন রাণী, তুমি কোন অবস্থাতেই আমায় পরিত্যাগ করতে পার না তো? আচ্ছা কেউ যদি বলে আমি দুশ্চরিত্র, আমি মদ খাই, আচ্ছা কেউ যদি বলে আমি নির্দ্দোষীকে খুন করেছি, কেউ যদি বলে আমি বিশ্বাস ঘাতক,—সব কিছু পাপে পাপী হলেও তুমি তো রাণী আমায় এমনি ভালই বাসবে? বল এসব শুনলেও তুমি আমায় পরিত্যাগ করতে পার না তো রাণী? বল সত্যি উত্তর দাও, এ জন্মে আমাদের বিচ্ছেদ হবেই না, আসছে জন্মে যদি হয়, বলে তোমার ভাবনার কাতরতার সীমা নেই। অতএব আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি রাণী, যে তুমি আমায় কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করতে পার না, তোমার কাছে আমার সাতখুন মাপ। আচ্ছা রাণী, এবার তোমার পরীক্ষা হবে কিন্তু, প্রস্তুত থেক। তুমি ভাগ্যকে বড় বেশী বিশ্বাস করত? অতএব জেনো সবই ভাগ্যচক্র।'

বার বার এসব কথা পড়ে পড়েও বেচারী এর মানে কিছুই খুঁজে পায় না, মনে মনে কেবলই বলতে থাকে হ্যাঁ ক-ই যে কথা বলার শ্রী, 'উনি দুশ্চরিত্র, খুনী, বিশ্বাসঘাতক, লোকে আমার

বলতে আসবে, আর আমি অমান 'ওঁকে' পরিত্যাগ করব। পরিত্যাগ করা এতই সহজ কিনা, সে পারে বরং পুরুষে, মেয়েরা নয়। তেমন দুর্দ্দিনই যদি আসে, তবে তো আরও এক মিনিট চোখের আড়াল করতে পারব না, অমঙ্গল আশঙ্কায়। কিন্তু কেন জানি না মনটা যেন ক্রমাগত 'কু' গায়; মনে হয় যেন কী একটা হয়েছে, তাই বড় কষ্টেই ঐ সব কথা আমায় লিখেছে, পূর্ব্বের চিঠিগুলি তো বেশ সহজ, শেষের গুলো পড়লেই যেন কান্না আসে, ভাল লাগছে না হ'য় তো সেখানে, ইচ্ছে তো একটুও ছিল না, নেহাত বাধ্য হয়েই না গেছে।'

ভোর হতে না হতেই সতীরাণীর ব্যস্ততায় বাড়িশুদ্ধ লোক জেগে উঠে বাড়ির মালিকের জন্য নানা আয়োজনে মাতল। বাড়ির সরকারকে ডেকে ষ্টেশনে গাড়ি পাঠাবার কথা বার বার বলে দিল, যেন সময়ের ভুল না হয়, তার এখন অনেক কাজ সে তো যেতে পারবে না, আর এই হাওড়া থেকে হ্যারিসন রোড্ কত মিনিটই বা লাগবে, তাই শাশুড়ীর সাক্ষাতে সে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে ছুটবে? শাশুড়ী আবার ওসব পছন্দ করেন না, ঘরের বৌ ঘরে গৃহস্বামীর আসার সংবাদে নানা আয়োজন করে রাখবে, ষ্টেশনে সাহেব মেমদের মতন ছুটে আবার অধৈর্য্যতা দেখান, নেহাতই বেহায়া কাণ্ড।

আটটা বাজে এই মাত্র স্নান সেরে সে নিজের শয়ন কক্ষে ফিরেছে, জানালা দিয়ে দেখল, একখানা ভাড়াটে গাড়ী হতে তার মা' ও বাণী নামল, সতীরাণী একটু অবাক হয়ে গেল, মা' এখন

যে, আর মুখটাও কেমন যেন শুষ্ক গম্ভীর, অবশ্য মা' সবই জানেন, জামাতার বিদেশ যাত্রা, আজই ফেরবার কথা, কিছুই তাঁর তো অবিদিত নেই, সেই সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে তিনি যে এই কারণে এসে উপস্থিত হবেন, এও যে অসম্ভব। তবে কি বাণীই তাঁকে ব্যস্ত করে নিয়ে এসেছে, ওঁকে দেখবার বাণীর বুঝি ইচ্ছে হয়েছে বড়।' কাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি সতীরাণী নিচেয় নেমে চলল, মা'কে একহাতে বাণীকে একহাতে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল, 'তোমারা যে হঠাৎ এলে মা? বাণী বুঝি তোমায় ব্যস্ত করেছে, যাক ভালই হ'ল, কিন্তু তোমার মুখ অমন কেন মা? চোখ যে ছল ছল করছে, কি হয়েছে মা তোমার আমায় বল।'

মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন, সতীরাণী দেখল, তাঁর চোখে জল, তাড়াতাড়ি মেয়েকে বলল, কি হয়েছে বাণী আমায় বল্? তোদের কাণ্ড দেখে যে আমার মন ধড়ফড় করছে।

বাণী উত্তর করল, 'কিছু তো জানি না মা কাল ঠাকুমার টেলিগ্রাফ এসেছিল বিকেলে, তখনই দিদিমা এখানে আসবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সকালে একটা চিঠি এসেছিল, সেই থেকে না' নাওয়া না' খাওয়া, দিদিমা কেবলই কাঁদছেন, কি যে হয়েছে কিছুতো বুঝতে পারছি না মা, কিন্তু বড্ড ভয় করছে যে আমার।'

মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে, সতীরাণী উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করল, 'ওমা! মা গো! কি হয়েছে শীঘ্র আমায় বল না আজকে ওঁদের আসবার দিন বিপদ হয়েছে নাকি কিছু? বল আমায় লুকিও না?'

মা গম্ভীর মুখে বললেন, মা' বিপদ ওদের কিছু হয়নি, হয়েছে তোমারই, এখনই আসবে সব, দেখতেই পাবে। আমার কপালে এ'ও দেখা লেখা ছিল, থাকতে পারলুম না, তাই তো নিজে এসেছি, তোমায় বুকে করে নিয়ে যাব বলে মা।"

কথা শুনে ভয়ে উদ্বেগে সতীরাণী থর থর করে কেঁপে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় চির পরিচিত 'হর্ণ' গাড়ির বেজে উঠল বাড়ির উঠানেই, শ্যামের বাঁশীর মতই উন্মাদিনী সতীরাণী সব ভয় ভাবনা ভুলে ছুটল, সেই প্রিয় মূরতি দেখতে। দেখল গাড়ি থেকে শচীন্দ্র নেমেই অভ্যাসমত ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে তারই মুখ খুঁজছে, চোখে চোখে মিলন, সতীরাণীর সমস্ত ভয় ভাবনার পাহাড় কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু অমন বিষণ্ণ ম্লান মুখ কেন, অসুখ করেছে নাকি কিছু, ওঁর মুখ দেখলে যে বুকটা কেঁপে উঠে, গাড়ির কষ্টের মুখ তো ও নয়। অন্যমনস্ক সতীরাণীর চমক ভাঙ্গল শাশুড়ীর হাঁক ডাকে, 'ওরে অ' ক্ষেন্তি এদিকে আয় না, ছোট বৌমাকে নামিয়ে নিয়ে যা, 'ও' কি এবাড়ির চেনে নাকি কিছু, যে নিজেই নাববে, যা নিয়ে যা দাদাবাবুর শোবার ঘরে বসাগে যা' স্তব্ধ মর্ম্মর মূর্তিবৎ বধু সতীরাণীর দিকে চেয়ে বললেন, যাও সতীনের মধু দিয়ে মুখ দেখগে, আর একটু পায়ের ধূলো দাও গে, যেন ঐ অভাগীর মেয়ে তোমার সৌভাগ্যের এক কণাও পায়, যতই হোক ঐ তো আমার এবংশের বংশধর, ছিষ্টিধরের মা, তুমি তো বাছা ঘর সাজান একটা ভাল ছবির তুল্যই, তবু তুমিই আমার ছেলের প্রাণ; এতো হাড়ে হাড়ে বুঝেছি বাছা

বা' না প্রতিমার মত মেয়ে আমার সইয়ের ওর রূপের এককণাও তোমার দেহে নেই; তবু ছেলে আমার একদিনের তরে চোখ তুলে চেয়ে ওর দিকে দেখলই না, এমনি গুণ, তুক ওকে করেছ বাছা, এখন তোমারই হাতে ঐ মা হারা অভাগীকে দিচ্ছি, আর দিচ্ছি তোমার শ্বশুর বংশের জল পিণ্ডের ব্যবস্থার ভার, তুমি কি রকম মানুষের মেয়ে এবার বুঝব আমি, ছেলেকে তো হার মেনেইছি, কি করে যে বিয়ে দিয়েছি সে আমি আর ভগবানই জানেন, এখন পরের মেয়ে তুমি, তবু তোমার উপরই সব আশা নিয়ে এসেছি। ছেলের একান্ত জেদেই তোমায় খবর দিইনি বাছা! তোমার মা'কে ত্যুই লিখলুম।' বলেই স্তম্ভিত বেহানের দিকে চেয়ে এক গাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন, এই যে ভাই এসেছ, তা বেশ করেছ, আমার সই তীর্থের পথে এই অসহায়া মেয়েটাকে আমায় গছিয়ে দিয়ে ভগবানের নামে শপৎ করিয়ে নিয়ে একদিনের রোগেই চোখ বুজল ভাই, কাজেই অগত্যা, বুঝতে তো পারছই সব ভাই।' এমন সময় নববধুকে উপরের ঘরে রেখে এসে ক্ষেন্তি চেঁচিয়ে উঠল ওগো তোমরা কেউ দেখতে পাচ্ছ না, বৌদিদি যে আমার কেমন হয়ে ঢলে পড়ে যাচ্ছেন গো। সতীরাণীর মা কেঁদে উঠলেন, চক্ষের নিমেষে শচীন্দ্র নিকটস্থ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সতীরাণীর মূর্চ্ছিত দেহখানি কোলে তুলে নিয়ে যেতে যেতে 'ডাক্তার' এই কথাটি ভৃত্যবর্গের দিকে চেয়ে উচ্চারণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনতে লোক ছুটল।

সতীরাণীর জ্ঞান ফিরে এল কয়েক ঘণ্টা পরে, চোখ মেলে

মাথার কাছে শচীন্দ্র বসে আছে দেখতে' পেল, তার পরে আবার চোখ বুজে পড়ে রইল কয়েক ঘণ্টা। শুনতে পেল বার বার শ্বাশুড়ী এসে শচীন্দ্রকে ডাকছেন, 'হ্যারে তোর কি সবই বাড়াবাড়ি? জ্ঞান তো ফিরেছে, ওর মাকে কাছে বসতে দিয়ে তুই স্নান আহার কর না; এই সারারাত্রি গাড়ির কষ্ট, তারপর কাপড়টাও যে ছাড়িস্‌নি, বেলা যে গড়িয়ে গেল একেবারে?' কিন্তু শচীন্দ্রের কর্ণে কথা কিছু প্রবেশ করছে তা' বোঝাই গেল না। খানিক পরে সতীরাণী ডাকল, মা! ও একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল, শচীন্দ্রের কোলে সতীরাণীর মাথা ছিল, একটু সরে সে বালিশে মাথা দিয়ে পাশ ফিরল। উদ্বেগ ব্যাকুল-কাতর কণ্ঠে শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করল তার হাত ধরে, 'রাণী! কিছু কষ্ট হচ্ছে তোমার? বল আমায়। উত্তর পেল না। কিছুক্ষণ পরে বলল, রাণী, তোমার কিসের দুঃখ, কিসেরই বা ভয়? আমি তো তোমারই আছি। লোকের দেহের উপর জোর চলে, মনের উপর নয়, আমি বড় হতভাগ্য রাণী, তাই এমন জটিল পাকে জড়ালুম। এসময়, আমার মনের এই অবস্থায় তুমি শুদ্ধ যদি এমন ভেঙে পড়, কোথা থেকে আমি শক্তি, শান্তি পাব রাণী? তুমি ওঠ, মন বাঁধ, এ সব ভগবানের কাছে আমাদের পরীক্ষা, তোমার হাসিমুখ দেখে আমি মৃত দেহে প্রাণ পাব রাণী, ওঠ আমার দিকে একবার তুমি চোখ তুলে চেয়ে দেখ।'

সতীরাণীর মা ঘরে ঢুকলেন, জামাতাকে সম্বোধন করে বললেন, 'বাবা যাও স্নানাহার কর গিয়ে, কতক্ষণ এমন করে বসে থাকবে?

আমি রইলুম তুমি উঠে যাও। হঠাৎ এই 'সক্'টা পেয়েছে, সামলাতে সময় নেবে। শচীন্দ্র উঠে গেল, স্নানাহার যৎসামান্য সেরেই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য একবার বাহিরে গেলেন, যাবার সময় ঘরে ঢুকে আর একবার ম্লান মুখে সতীরাণীকে দেখে, খাশুড়ীকে বললেন, 'আমি একবার ডাক্তারের কাছে যাই, দেখি কি পরামর্শ দেন, ততক্ষণ আপনি দৃষ্টি রাখবেন।'

যেমনি শচীন্দ্র বেরিয়ে গেলেন, অমনি সতীরাণী মা'কে বললেন, 'মা! 'ও' ফিরে আসার আগেই আমাদের বেরিয়ে পড়া চাই, শীঘ্র গাড়ী আনতে বল তুমি, এখানে যে আমার আর স্থান নেই, সে তো বুঝতেই পারছ।'

মা' চোখের জল মুছে বললেন, একবার তোমার খাশুড়ীকে বলে আসি, তিনি মত করেন কিনা দেখি, তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'সতী তুই কি থাকতে পারবি মা, তোকে তো আমি জানি, তার চেয়ে'—

সতীরাণী মা'য়ের কথায় বাধা দিয়ে বলল, 'ওসব কথা পরে ভাবা যাবে মা, এখন চল তো, থাকতে না পারি মরতে তো পারব, তাই বলে এদের পথের কাঁটা হতে তো পারবনা মা!'

খাশুড়ী সতীরাণীর চলে যাবার কথা শুনে, বললেন, 'তা' যা' ইচ্ছা করুক, যদি সতীন নিয়ে ঘর না করতে পারে তবে যাবে বৈকি চলে, বৌয়ের তো অভাব নেই। যাকে আজ এনেছি এর তিনকুলে. কেউ নেই একদিন যাবার, আমি তখনি বুঝেছিলুম, ও বৌ সতীন নিয়ে ঘর করবার মেয়েই নয়; স্বামীকে

সারাক্ষণই আগলে থাকে।'

দীর্ঘ আট নয় বৎসর গত হয়ে গেছে, যে সতীরাণী ভেবেছিল স্বামীকে ছেড়ে একদিনও বাঁচা তার অসাধ্য সে প্রতিদিন অবাক্ হয়ে দেখে, 'বেঁচে আছি'; দিন ও রাত্রি শচীন্দ্রের ধ্যানে সে তন্ময়; দেহের বিচ্ছেদ হ'লেও মন অনুক্ষণ সেই একজনের পিছে পিছে ঘোরে। সকালে উঠেই সে শচীন্দ্রের ঘুম ভাঙায়, চা খাওয়া থেকে আরম্ভ করে স্নানাহারের পর্য্যন্ত তদারক সে এখান থেকেই করে। অফিসেও কখন সে কর্ম্মব্যস্ত, কখন নিরালায় আছে সে সংবাদও রাখে। যদি কেউ বলে, 'ওরে সতী, বড় ভূমিকম্প হচ্ছে! শীঘ্র বাড়ি থেকে পালিয়ে আয়' সতী ততক্ষণ তাড়াতাড়ি খোঁজ নিতে ব্যস্ত যে কলকাতার কোন ব্যক্তি বিশেষের বাড়িতেও ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে কি না, এবং সে ঘুমে অচেতন কি না।' দেখে শুনে মা মেয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছেন। সবাই বলে, 'সতীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে'। সে অধিকাংশ সময় নিজের ঘরটীতে ও বাকী সময় ঠাকুর ঘরে কাটায়, আর তার কেউ কোথাও আছে কি না, তার জন্য দুঃখ পাচ্ছে কি না এসব অনুভব করবার পর্য্যন্ত শক্তি সে হারিয়েছে। দেখে শুনে মধ্যে মা একদিন বলে ছিলেন, 'সতী; জামাইকে একবার আসতে লেখ না, সে লজ্জায় আসতে পারছে না না লিখলে; মেয়ে মানুষের অত-গরব কি সাজে মা? সে তো তেমন ছেলে নয়, তার মা'ই তো এই সব ঘটালে।'

সব ভুলে সতী চিঠি লিখে বসল, 'একবার এস' কিন্তু চিঠির উত্তর এল না, মেয়েলী হাতের চিঠি একটা এল। তার সতীন লিখেছে

'তিনি শয্যাগত, একবার' সারছেন, আবার পড়ছেন রোগে, এ অবস্থায় তিনি যাবেন কি করে, তুমিই এস।'—

এ চিঠি পেয়ে অভিমানে সতীরাণী তিন দিন না খেয়ে কাটাল, মনে মনে বিশ্বাস 'আসতে ইচ্ছুক নয় ও চিঠিটার পর্য্যন্ত জবাব দিতে নারাজ, তাই ওকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছে।' সতীরাণীর চিঠি যে শচীন্দ্রের হাতেই পড়েনি, এ'টা আর সতীরাণী অনুমান করতে পারল না।

সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে আরও দুই একবার সে শচীন্দ্রকে ডেকেছিল, 'একবার এস' কিন্তু কোন জবাব পায়নি চিঠির।

এবার বাণীর বিয়ে না দিলেই নয়, মেয়ে বড় হয়েছে ; যার কাজ সে যখন নিশ্চিন্ত আছে, তখন বাণীর দিদিমাকেই অগত্যা সে চিন্তা করতে হয় তো। কাজেই তাঁর কর্ম্মচারীদের দ্বারা কলকাতায় বাড়িভাড়া করা হল, ও সবাই বাণীর বিয়ের জন্য কলকাতায় এল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বাণী কলকাতায় এসে প্রায়ই বায়েস্কোপে যায়, মা দিদিমা হাসিমুখে সম্মতি দেন, কি জানি কোথায় পড়বে, কদিনই বা আর আমাদের কাছে, বেড়াক একটু যেখানে যেখানে ইচ্ছা যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় বাণী বায়েস্কোপে গেছে, সতীরাণীর মা পল্লী গ্রামে চিরদিনই কাটালেন, পড়সীর বাড়ি বেড়ান, আলাপ পরিচয় না করলে তাঁর দিন কাটে না। মেয়ে তো ঐ একরকম। কারো সঙ্গে কথাই বলে না, নাতনীও বায়স্কোপে, কাজেই পাশের বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গে তার খুব ভাব ; তিনি বেড়াতে গেছেন তাদের বাড়ি।

বাণীকে বলেছেন সে এসে যেন তাঁকে ডেকে নিয়ে আসে।

একলা সতীরাণী বাড়িময় ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ, তারপর মনে হল, 'কলকাতায় এত কাছে এসেও একবার কোনরকমে চুরি করে সেই মুখখানি দেখা যায় নাকি? কত সম্ভব অসম্ভব কল্পনা মাথায় ঘুরতে লাগল—'অফিস ভাঙ্গবার টাইমে, গাড়ীর মধ্যে আত্মগোপন করে রাস্তায় অপেক্ষা করলে কেমন হয়, একবার চকিতের ন্যায় দেখা যাবে নাকি তাঁর গাড়ীতে উঠার সময়, না কোন এক সময়ে ঐরূপ গাড়ীতে আত্মগোপন করে বাড়ির সামনে ঘুরে দেখবে একটীবার দেখতে পায় কি না। এত কাছে এসে না' দেখে আমি কি করে ফিরে যাব গো! ছেলেমানুষের মতই সতীরাণী খানিকক্ষণ কেঁদে ভাসাল; রাস্তায় কত সময়ই সে আশান্বিত হৃদয়ে চেয়ে থাকে যদিই কোন কারণে সেই আকাঙ্খিত মানুষটী এই পথে যায়। সে একটীবার দেখবে শুধু। কিন্তু যায় না। এক মাস কেটে গেল, সতীরাণী এবার স্থির নিশ্চয়, যে করেই হোক একবার দেখবেই সে; কিন্তু চিঠি লিখে বাড়িতে ডেকে এনে সে চেষ্টা আর কোন দিনই করবে না, তাতে যত দুঃখই পাক্ না কেন। কোনরকমে একবার দূর থেকে লুকিয়ে দেখে আসব শুধু; আসুক আজ বাণী, তারই সঙ্গে পরামর্শ করে, তারই সাহায্যে যাকে লুকিয়ে একাজ করতে হবে আমায়'—মনে মনে সতীরাণী ভাবতে লাগল চোখের জলে ভেসে, আমার চেয়ে ও'বাড়ির ঝি, চাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার, এমন কি কুকুরটা পর্য্যন্ত ভাগ্যবান; একটীবার চোখের দেখার জন্য এমন করে কেউ কেঁদে মরছে না, প্রাণভরে

সারাক্ষণই সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে চক্ষু সার্থক করছে।

হায় সতীরাণী, কি করুণ মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদ তোমার মর্ম্মস্থল ভেদ করে মূর্ত্ত হয়ে উঠছে তোমার চোখের জলে, তোমার কাতর বিলাপোক্তিতে! ঈপ্সিতকে, বাঞ্ছিতকে হারিয়ে তোমার মতই কত জনের কত উৎসবময়ী রজনী, কত প্রাণভরা ভালবাসা, কত আকুল পথ চাওয়া এমনই বিফল হ'য়েছে। যাকে একটী বার চোখের দেখার স্থিতর তোমার জীবন মরণ নির্ভর করছে, তাকে কাছে পেয়েও চোখ তুলে দেখবার প্রয়োজন কারো হয় কি?'

সতীরাণী যখন স্থির করল, 'নিশ্চয়ই আমি এই উপায়ে তাকে দেখব, এবং এইখান থেকে, এইখানে কৃতকার্য্যও নিশ্চয় হব', তখন তার মন অনেকদিন পরে একটু যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠল, এবং সে ভাবল, 'রবিবাবুর কোন একটা গান করিগে, অনেক দিন এসব পাঠ উঠিয়ে দিয়েছি, দেখি কি রকম পারি। বাণীর ঘরে তার পিয়ানোর সন্ধানে সতীরাণী চলল, অনেকদিন পরে স্বাভাবিক মানুষের মতই। নীচে এসে বৈঠকখানার পাশের ঘরটায় বাণীর বাজনা থাকে, সে ঐখানে শিক্ষকের কাছে শেখে। ওর দিদিমা কলকাতা এসে ভাল ওস্তাদ রেখেছেন, গান বাজনা শেখার জন্য। সতীরাণী সে ঘরে এসে অনেকক্ষণ ধরে গৎ বাজিয়ে চলল! শুধু কি গান করবে? কিছুই ভাল লাগল না। তারপর অন্যমনস্ক অবস্থায় কখন যে সে সমস্ত প্রাণ ঢেলে গেয়ে চলল, নিজেই তা' জানতে পারল না কি গাইছে।

নাই যদি বা এলে তুমি এড়িয়ে যাবে তাই বলে ?
অন্তরেতে নেই কি তুমি সামনে আমার নেই বলে ?
মন যে আছে তোমায় মিশে আমায় তবে ছাড়বে কিসে ?
প্রেম কি আমার হারায় দিশে, অভিমানে যাই বলে।
বিরহ মোর হোক্না আকুল, সেই বিরহের সরোবরে,
মিলন কমল ঐ তো দোদুল, অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে ।
তবু তৃষায় মরে আঁখি, তোমার লাগি চেয়ে থাকি,
বুকের পরে পাব না কি, চোখের 'পরে নেই বলে ?

গানের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে সতীরাণী ভেসে, বাজনার ডালায় মাথা রেখে চুপ করে পড়ে রইল। নিস্তব্ধ ঘর; বাণী ডাকল আস্তে আস্তে মাথায় হাত দিয়ে, 'মা! বাবা এসেছেন'। তীরবেগে উঠে পড়ল সতীরাণী। 'কই কই ? কোথায় রে ? বাণী বলল, 'একটু আগে এসেছেন, তুমি গান করছিলে, তাই ডাকতে বারণ করলেন, এই পাশের বৈঠকখানায় তিনি বসে আছেন। ডাকব মা এই ঘরে ? আমি একবার দিদিমাকেও গিয়ে ডেকে নিয়ে আসি কেমন ? বায়স্কোপে বাবার সঙ্গে দেখা হল, ওরা বাড়িশুদ্ধ সব এসেছেন; কত আদর করলেন আমায়, আর তোমারই মত কাঁদেন পর্য্যন্ত উনি,'। আমি বললুম, 'আমরা এসেছি, চলুন মা আপনি। তিনি বললেন, তোমার মার শরীর খারাপ, যদি রেগে যান, আর অনিষ্ট ঘটে কিছু।' আমি বললুম, 'তিনি কেবল রাত দিনই আপনার জন্যে কাঁদেন, আর আপনাকে দেখে অনিষ্ট হবে ? তবে এসেছেন। ডাকব মা বাবাকে এ ঘরে ?'—

সতীরাণী অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ওরে কেন তুই জোর করে ধরে নিয়ে এলি, আসবার ইচ্ছে নেই হ'য়তো তোর জেদে দায়ে পড়েই এসেছেন। কতবার লিখেছিলুম, 'একটীবার এস'। চিঠি খানার পর্য্যন্ত জবাব দেন নি, সে মানুষকে তুই কেনই ধরে এনেছিস ? আমার কিছু দরকার নেই কারু সঙ্গে দেখা করার তুই বলে আয়। সঙ্গে সঙ্গে সতীরাণী ওপরে চলে গিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। একটু পরেই জননীর গলা শোনা গেল, 'ওরে সতী একি করলি তুই, জীবন বের করে ফেলছিস তুই যার জন্যে, তাকে ফিরিয়ে দিলি ? সে, কী মুখ করে চলে গেল দেখতিস যদি। ওরে এখনও বাণীকে দিয়ে ডেকে পাঠা, বেশী দূর যায় নি হয় তো'।

'বেশী দূর যায় নি হয়' তো',—এই কথা সতীরাণীর কানে ভেতর দিয়ে মরমে পশে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিল। সে চলে গেল, চলে গেল সে, সতীরাণীই ফিরিয়ে দিল তাকে, কেমন করে এ কাজ পারল সে ? কতদিন, সে কতদিন—কত যুগ হয়ে গেল যে দেখিনি আমি, একটিবার দেখবার জন্য এই মাত্র যে ছটফট্ করছিলুম। পাগলের মতই সতীরাণী ছুটল তেতলার ছাদে। বাড়ির যারা এসেছিল, তারা গাড়িতেই ফিরে গেছে, একলা শচীন্দ্র নিশ্চয়ই এটুকু হেঁটেই যাবে। একবার সেই প্রিয় মূর্ত্তি যদি দেখা যায়, এই আশায় ছুটল সতীরাণী। ঐ যে ঐ, ঐ, পিছন ফিরে আস্তে আস্তে ফিরে চলেছে শচীন্দ্র ; মুখ তো দেখা গেল না, মাত্র পিছন দিকের একটু অংশ সতীরাণীর চোখে ভাসল, যতক্ষণ্ দেখা গেল দেখে, সতীরাণী ফিরে এসে ঠাকুরঘরে খিল দিয়ে গোপীনাথজীর

চরণে আছড়ে পড়ল। ঘরের দরজা ঠেলে বাণী ডাকল 'মা! ওমা! এখন আবার বেশ দোর দিলে তুমি, খাবার সময় হল, কখন খাবে তুমি? দোর খোল আমি কথা দিচ্ছি কালই বাবাকে ফের ধরে নিয়ে আসব, কী-ই যে তোমার কাণ্ড বাপু, কেঁদে কেঁদে মরে যাবে, তবু একবার দেখবে না। আচ্ছা কাল আমার যা ইচ্ছে করব, তোমার কথা আর শুনছিনি আমি।'

সতীরাণীর মা বললেন, 'বাণী, শত মাথা খুঁড়লে আর মা'য়ের ঘরের দরজা এখন খোলাতে পারবিনি তুই, তার চেয়ে নিজে খেয়ে দেয়ে শুগে যা' মনে মনে যদি কিছু থাকে কাজেই করিস, ও আপনিই শান্ত হলে দরজা খুলবে, এতদিন দেখছিস্ তবু ওকে বুঝলি না তুই?''

বিমর্ষ মুখে বাণী ফিরে গেল। মা'ও খানিক ডাকাডাকি করে চলে গেলেন বরাবরের মত ওর ঘরে খাদ্য সামগ্রী ঢেকে রেখে।

ঠাকুর ঘরের মধ্যখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সতীরাণী। চোখের জলের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মেঝেয়; 'ওগো এত কাছে এলে, তবু ঐ মুখখানি একবার দেখতে পেলুম না যে, এ আমি কি করলুম, তোমায় বার বার ডেকেছি, আসনি, সেই অভিমান মনে রাখার আমার সাধ্য কোথায়? তুমি তো জান আমায়, তবে কি করে ফিরে গেলে গো? তোমরা পুরুষ, তোমরা যা পার, আমরা যে তা পারি না, তোমরা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কোথায়? তুমি জান এ আমি সহ্য করতে পারব না, তবু তুমি কি করে চলে গেলে গো! কতদিন দেখিনি তোমায়, আর যে পারি না, এস ফিরে এস, ওগো

ফিরে এস তুমি একবার।' ক্লান্ত অবসন্ন সতীরাণী কেঁদে কেঁদে ঘরের মেঝেয় নেতিয়ে পড়ল একেবারে। পাশের বাড়িতে মধুর রমণী কণ্ঠে কে গান ধরেছে তখন—

'এস প্রিয়তম এস ফিরে এস,
শেষ এ মিনতি এস হে ফিরে।'

শ্রান্ত অর্দ্ধমৃত সতীরাণী দুই কর্ণ সজাগ করে সেই গান শুনতে লাগল, তারপর অনেকক্ষণ পরে একটু শান্ত হয়ে মাথা তুলল, 'ওমা ওকী, ওকে গো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে? শিরায় শিরায় ওর যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছে না ও ভাল করে চোখ মুছে আবার দেখল। ওমা তাই তো সেই-ই তো ঐ পরদার পাশে আত্মগোপন করে এতক্ষণ মজা দেখছিল। সেই দুষ্টু হাসি ভরা মুখ, যেন বলছে 'বড় আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলে, না? কেমন মজা!' কতক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে সতীরাণী প্রাণভরে সে মুখ দেখল বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়ে। যখন জ্ঞান হল, দেখল সেই অপূর্ব্ব হাস্যমণ্ডিত মুখে সে ধীরে ধীরে তার কাছে সরে আসছে. নাঃ ঠিক তেমনিই আছে এতোটুকু বদলায়নি, মিথ্যে সন্দেহে আমি কেঁদে মরেছি। কিন্তু কি লজ্জা! সব তো—এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে; আমার এই এত কান্নাকাটি, আবার গরব করে 'দেখার দরকার নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া, এই বলে এক্ষণি কত ঠাট্টাই না করবে এখন, নাঃ কি চালাক। আমি যখন ছাতে দেখলুম চলে যেতে, ততক্ষণে উনি ঐ পাশের গলিটায় ঢুকে সকলের অলক্ষিতে বাড়িতে ঢুকে এই নিরালা ঠাকুর ঘরে এসে লুকিয়ে

আছেন। কতদিন চেয়ারের তলায় আলমারির পিছনে লুকিয়ে আমায় খুঁজিয়ে মজা করছে, সেই স্বভাব এখনও সম্পূর্ণ আছে দেখছি। না বাপু, মুখ তুলতে আমার ভারি লজ্জা করছে, ছি, ছি, কি ছেলেমানুষীই না ভাববে আমার কাণ্ডকে, ফিরিয়ে দিয়ে আবার কেঁদে কেটে অস্থির। ঐ, ঐ, না পায়ের শব্দ? ঠিক মাথার উপরই, ওগো এ অসহ্য সুখ আমি সইতে পারব তো? তা বলে মাথা তুলে কথা আমি কিছুতেই বলছি না আগে, বড় লজ্জা করে যে—

সকালেই সতীরাণীর মা, চীৎকার করে উঠলেন, ওরে অ ক্ষেমী, তোরা কেউই দৃষ্টি রাখিসনি, কাল সতী যে সারারাতই ঠাকুর ঘরে পড়ে আছে খায়ও নি, কিছুই না। যা বাপু, তোরা এখনই কেউ ওর শ্বশুরবাড়ি, জামাইকে এখনই আমার নাম করে ডেকে আন্, ও মেয়ে বেঘোরে মারা যাবে দেখছি।

ক্ষেমী জানালা দিয়ে দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠল 'ওগো মা দিদিমনি কেমন ভাবে পড়ে আছে দেখ না, আমি ভাল বুঝছি না গো ;ডাকলে তো, সাড়াও মিলছে না তোমরা দোর ভাঙ্বার চেষ্টা দেখ বাপু!

সতীরাণীর মার গগনভেদী আর্ত্তনাদে পাড়া প্রতিবেশী এসে, পুলিশ ডাকবার ব্যবস্থা করলেন, নচেৎ ও দরজা কেউই ভাঙতে রাজি নয়।

কুঁড়ির ভিতর গোপন গন্ধ

বিডন ষ্ট্রীটে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে একটী সুদৃশ্য মূল্যবান "কার" দেখা দেওয়া মাত্র তক্‌মা আঁটা দুইজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। গাড়ি হইতে ব্যস্তভাবে একটী পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ, বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক নামিয়া কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরী কোথায় জানিস্ ?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "তেতালার ছাদে, রামবাবুদের বাড়ির মেয়েরা এসেছেন, তাদের সঙ্গে খেলা করছেন।"

"আচ্ছা" বলে তিনি দু'মিনটে সিঁড়ি টপ্‌কে টপ্‌কে ছোট ছেলের মতই উৎসাহিত ভাবে উপরে উঠিয়া চলিলেন, তাঁর পরিধানে উৎকৃষ্ট মিহি ধুতি পরিপাটী করিয়া কোঁচান, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পাম্পসু, বয়স পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ হইলেও উৎসাহি এবং শক্তি আটাশ বছরের যুবকের মত। যারা জানে, তারাই জানে বয়স পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ, যারা জানে না, তারা চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক বলিয়াই মনে করে, এমনই সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ কান্তিময় তাঁহার শরীর।

তেতালার ছাদে আসিয়া তিনি দেখিলেন, গৌরী অনেকগুলি মেয়ের সহিত নাচের আসর জমাইয়া তুলিয়াছে। তিনি গৌরীকে

বলিলেন, "ওরা ততক্ষণ খেলুক, তুমি একটু আমার সঙ্গে এসতো দিদু, দরকার আছে, আমরা একবার চার তলার ছাদে যাই,"—গৌরী এতগুলি সঙ্গী ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছা জানাইল, কিন্তু পিতামহ যখন কারণটা তাহার কানে কানে বলিলেন, তখন সে উৎসাহিত হইয়াই ছুটিল, যাইতে যাইতেই বলিয়া গেল, "তোরা ততক্ষণ খেল্ ভাই, আমি এখুনি আসছি।"

তারপরই চার তলার ছাদ হইতে গৌরীর মধুর সুর-লহরী ভাসিয়া আসিল, তখন সব মেয়েরা বলে উঠল, "গৌরীর দাদুমনী গান শেখাতে গৌরীকে ডেকে নিয়ে গেলেন ভাই, গৌরী এখন আর আসবে না বোধ হয়।"

জমিদার ভূমেন্দ্রনারায়ণ পালিতের অত্যন্ত গান বাজনার সখ। তাঁহার বাড়িতে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন কলিকাতা সহরের বিখ্যাত গায়কদের শুভাগমন হয়, এবং সেদিনে বন্ধুবর্গের নিমন্ত্রণ হয় ও আহারাদির বিরাট আয়োজন হয়। সারা রাত্র গান বাজনায়ও তাঁহাকে ক্লান্ত বিরক্ত করিতে পারে না, এমনই তাঁহার গান বাজনায় আশক্তি; এই ভূমেন্দ্রনারায়ণের একটা ভয়ানক ছেলেমানুষী ছিল; তিনি কাহারও ভুল সুর শুনিলেই স্থান, কাল, পাত্র, ভুলিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, "আচ্ছা বাপু, ভুল গাহিয়া লাভ কি, অমন সখ কি না করিলেই নয়?" এহেন ভূমেন্দ্রনারায়ণের অষ্টম বর্ষীয়া পৌত্রী গৌরী যে এই বয়সেই গান বাজনায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? তিনি গৌরীর প্রতিভা দেখিয়া অতি শিশু বয়স হইতেই, ভাষা ফুটিতে না ফুটিতেই, মাষ্টার, ওস্তাদ রাখিয়া গান শিখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

তাছাড়া সকলে বলিত, "গৌরীর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানই তাহাকে এতটুকু বয়সে এমন গানে ওস্তাদ করিয়াছে, একবার ভিন্ন দুইবার তাহাকে শিখাইতে হয় না ; যেন জানাই ছিল, একটু মনে করাইয়া দিল মাত্র।

যাহারা শিখাইত, তাহারা বার বার ভূমেন্দ্রবাবুকে বলিত, "কালে এমেয়ে নিজেই গান ও সুর রচনা করিবে। উপস্থিত এখন ভূমেন্দ্র-বাবু আসিতে আসিতে শুনিয়াছেন যে, তাঁহার বন্ধু-কন্যা "লিলি" রবিবাবুর একখানি বিখ্যাত গান ভুল সুরে গাহিতেছে ছাদে বসিয়া ; এবং সেই ছাদে তাঁহার বন্ধুটিও উপস্থিত আছেন।

আর যায় কোথা, তাড়াতাড়ি গৌরীকে লইয়া চার তলার ছাদে উঠিয়া গানটা গাহিয়া শুনাইয়া দিতে বলিলেন, যে ওরা কি রকম বেখাপ্পা ভুল গানে তন্ময় হইয়া আছে, বুঝুক একবার। গৌরীও তাহার সুধাস্বরলহরী দ্বারা বুঝাইয়া দিল লিলি ও তার বাবাকে যে, ভূমেন্দ্রবাবু পৌত্রী সহিত তাহাদের লজ্জা দিতে ছাদে উঠিয়াছেন। তৎক্ষণাৎই লিলির গান বন্ধ হইয়া গেল, এবং পরদিন লিলির পিতাকে এজন্য কম মিষ্ট তিরস্কার সহিতে হয় নাই, "জান তুমি যে ভুল সুর সহিতে পারি না, তাও আবার বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী হইতে।"

রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, ভূমেন্দ্রবাবু পৌত্রী গৌরীর সহিত আহারে বসিয়াছেন, কাছে দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী মনোমোহিনী পাখা হস্তে বসিয়া। এইটী তাঁহার প্রথম পক্ষের গর্ভজাত পুত্রের কন্যা, ইহাকে নিতান্ত শিশু রাখিয়াই ইহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। ভূমেন্দ্রবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী, একমাত্র উপযুক্ত বিবাহিত পুত্র, ও কন্যার সহিত এই কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে এই পৃথিবী হইতে

অন্তর্হিত হইয়াছেন আকস্মিকভাবে ; এবং যেন ষড়যন্ত্র করিয়াই, তাঁহাকে একা এই মায়া মোহময় সংসারে পরিত্যাগ করিয়া মজা দেখিবার জন্য ; তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিধবা পুত্রবধূ ও দুইটা ক্ষুদ্র পৌত্র পৌত্রী ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন মাত্র। ভূমেন্দ্রবাবু কিছু-দিন পত্নী ও পুত্র-কন্যার শোকে উন্মত্ত হইয়াছিলেন এবং এই গুঁড়া কটা না থাকিলে তিনি হিমালয়ের গুহায় গিয়া শোকের জ্বালা প্রশমিত করিতেন, কিন্তু এই গুলিই "পায়ের বেড়ী"। ইহাদের আবার মানুষ করিতে হইবে, এই বিপুল সম্পত্তি ক্ষুদ্র জীবদের মুখ হরণ করিয়া গ্রাস করিবার লোকেরও তো সংসারে অভাব নাই। অতএব যাওয়া যখন তাঁহার হইলই না, সেই অকৃতজ্ঞ পত্নী, পুত্র ও কন্যার চক্রান্তে, "কেন বাপু যখন আমায় তোমরা পরিত্যাগই করিলে এগুলা আমার ঘাড়ে চাপাইয়া মজা দেখিবার কি প্রয়োজন ছিল ?"—তখন তিনিও চোরের উপর বাটপাড়ি করিতে পারেন, ইহা দেখাইয়া দিবার জন্য এই বয়সে দ্বিতীয় পক্ষ আনিয়া তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ দিয়াছেন ; এমন কি একটী পুত্ররত্ন দুলাল চাঁদেরও মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া দগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি প্রয়োগ করিয়াছেন।"

তবে সেই অকৃতজ্ঞদের কুব্যবহারের জন্য তো আর এই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দণ্ড দেওয়া যায় না, বা ইহাদের মাতা ভদ্রলোকের মেয়েকেও কিছু বলা যায় না যে, "বাপু তুমি ছেলে মেয়েদের লইয়া পিত্রালয়ে বাস কর, আমি প্রথম জীবনের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই"। ঐ ভদ্রলোকের মেয়ের এ দশার জন্য দায়ী তো তিনিই। তাঁহার পুত্রের মামারা যখন অযাচিতভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি না

মানুষ, কিন্তু আমরা আপনার ছেলের "কোষ্ঠি" প্রস্তুত করিয়াছি, তাহার তেইশ, চব্বিশ বছর বয়সে "পতাকা" আছে, ইহাতে প্রায় কেহই বাঁচে না; অতএব এখন ইহার এত ছোট বয়সে বিবাহ দিবেন না"। কিন্তু তখন তিনি গ্রাহ্যও করেন নাই সেকথা, বলিয়াছিলেন, "ওসব আমি বিশ্বাস করি না, আমাদের বংশে চিরদিন ছোট বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহ হয়, তার আমার এক ছেলে, ছেলের যে যেখানে আছে, সবাই উদগ্রীব হইয়া আছে, বিবাহ দিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য; বিবাহ দিব না, এ হইতেই পারে না।" অতএব তাঁহারই জেদের জন্য ঐ ভদ্রলোকের মেয়ের আজ এ দশা। তাছাড়া লোকে তো আর তাঁহার পত্নী, পুত্র কন্যার অবিবেচনার কথা ভাবিবে না, ভাবিবে জমিদার ভূমেন্দ্রনারায়ণের পুত্রবধূ পৌত্র-পৌত্রী সহিত তাহার পিত্রালয়ে প্রতিপালিত হইতে চলিল, আর বেটা বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়া দিব্য সংসার পাতিল।" তাছাড়াও গৌরীকে, খোকনকে ছাড়িয়া ও মাতৃতুল্যা স্নেহ করুণার প্রতিমূর্ত্তি বধূ মাতাকে ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকা যে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি যে মায়ের মতই তাঁহার সব দোষ ত্রুটী ঢাকিয়া ছোট ছেলের মতই সেবা, যত্ন মমতা দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। অমন গুণবতী পুত্রবধূ কয়-জনের ভাগ্যে জুটে? অল্প বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, সেই মা'ই তাঁহার পুত্রবধূ বেশে এজন্মে তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছেন আর কি।"

যাহা হউক ভূমেন্দ্রবাবু আহারে বসিয়া দক্ষিণ হস্তের দুইটী হীরক অঙ্গুরীয় সবে মাত্র খুলিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলীতে পরিতেছেন, এমন

সময়ে নূতন গৃহিণী আরম্ভ করিলেন, "হ্যাঁগা তোমার কি আক্কেল, অত বড় মেয়েকে নিয়ে গিয়ে চার তলার ছাদে গলা ছেড়ে গান গাইয়ে লোককে টেক্কা দিতে শেখান খুব ভাল কাজ নয়! পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়েছে, তারা ঐ নাচ গান-উলি ধিঙ্গি বৌ নিয়ে করবে কি শুনি? সে কথাটা মনে রেখে কাজ করলেই ভাল হয় না?"

হাত গুটিয়ে নিয়ে ভূমেন্দ্রবাবু উত্তর করলেন, "ও এখন নেহাত বাচ্চা, গান গেয়েছে, তার হয়েছে কি? গাইবার জন্যই না শেখান হয়েছে, তারা কি বলবে না বলবে সে ভাবনা ভেবে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। বিয়ে দিয়েছি, এবং কোথায় দিয়েছি, সে কথা আমার সর্ব্বক্ষণ মনে আছে কিন্তু সম্বন্ধটা তোমার বাবাই এনেছিলেন নয়? ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই "বাক্‌দত্তা" দু'বছর, দেড় বছর, পাঁচবছর এমন তো কত বিয়েই বাপ, মা'র সাথে তখনকার কালে হত, তাই বলেই তাঁরা তখনই একজনের "স্ত্রী" হয়ে, "মা" হয়ে গেল নাকি, শৈশব জীবনটা উল্টে যাবে নাকি? বিয়ে হয়ে থাকে, সেই বিয়েটাই আর হতে পারবে না, এই পর্য্যন্ত, তাই বলে ওর শিক্ষা, দীক্ষা, শিশু জীবনের আনন্দ, আরাম বিরাম, সবই শেষ হয়ে গেছে নাকি? চব্বিশ ঘণ্টা বিয়ে হয়েছে, বিয়ে হয়েছে, এ করো না, তা করো না, করে ওকে তোমরা মেরে ফেলার যোগাড় করে তুলেছ যে দেখছি, তাই ভাবি, মানুষ সময়ে সময়ে এমন মারাত্মক ভুলও করে বসে, যা সংশোধন করবার কোনই পথ থাকে না, আমারও দেখছি তাই"—

এই ঝাঁজের উত্তর শুনে গৃহিণী কিছুক্ষণ মুখ ভার করে চুপ করলেন, গৌরী এসব আলোচনা আজকাল প্রায়ই শুনতে পায়, সে অতি

সঙ্কুচিতভাবে আহার শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে গেল; যাবার সময় একবার করুণ-নেত্রে পিতামহের অভুক্ত আহার্য্য, ও বিরক্ত বিরস মুখ দেখে চলে গেল, কিছুই বলবার সাহস হল না, কারণ চোখ ভরে জল যে এসেছে, সেটা আর পিতামহ দেখতে না পান, তারই তাড়ায়।

গৌরী উঠে যাবার একটু পরে ভূমেন্দ্রবাবু আহারে মনোনিবেশ করলেন, কিন্তু সেদিন আর বিধাতা তাঁহার আহার মাপে নাই, সবে দু'এক গ্রাস গলধঃকরণ করিয়াছেন, এমন সময় নূতন গৃহিণী জোরে জোরে পাথা নাড়িতে নাড়িতে আবার আরম্ভ করিলেন, "তুমি তো গৌরীর কথা কিছু বললেই রেগে আগুন হয়ে যাও, কিন্তু ভুগতেতো হবে আমাদের, কাজেই না বললেও বাঁচি না, গৌরী তোমার যে বস্তু আমারও তাই; শ্বশুর বাড়ি কথা শোনাবার সময় মা' ঠাকুমাকেই শোনাবে, ঠাকুরদাদাকে দোষ দেবে না। তো; তা বলি অতগুলো টাকা তো ঐ এক ফোটা মেয়ের পিছনে ঢালছ, তাতেও হল না, আবার ঐ পণ্ডিত মশাইটাকে কাল থেকে রেখেছ কি করতে শুনি? শুনছি উনি গৌরীকে সংস্কৃত পড়াবেন, তা, ঐ অং, বং. সং, কচি মেয়ের মুখ দিয়ে বেরবে? তুমি যে একেবারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, সব কিছু এই বয়সেই ওর মাথায় ঢোকবার জন্যে, ঐটুকু মেয়ে, যা শিখেছে তাই ঢের; আবার তার ওপর সংস্কৃত পড়বে, এই মিথ্যা অছিলা করে খরচ করবার কি দরকার, এ দিকে তো বলছ, এক ফোঁটা মেয়ে, ওর কি জ্ঞান আছে? যা ইচ্ছে তাই-ই ও করবে।"

গম্ভীর কণ্ঠে ভূমেন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন, "রাম বললে গৌরীকে এখন

থেকেই একটু করে সংস্কৃত পড়ান দরকার, অল্প অল্প অক্ষর পরিচয় যা হয় এখন তাই লাভ, ও তো মেধাবী, ছেলেমানুষ হলেও বড়দের চেয়ে ঢের বেশী শেখবার আগ্রহ। তোমায় আবার বারণ করছি, এসব দিকে নজর দিও না ; লেখা পড়া শেখা গৌরীর আরও কত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—সে তুমি বুঝবে না।”

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব বুঝি, ও আর কদিন তারা এমন কাঁচা লোক নয় যে, বেশী দিন এসব বিবিয়ানী ঢং শিখবার জন্যে বৌকে বাপের বাড়ি ফেলে রাখবে, এই নিয়ে যাবার খবর পাঠাল বলে, তারপর দেখব কতই আদিখ্যেতা সেখানে চলে। এখন ও'তো পরের সম্পত্তি, তোমার সাধ্য কি তাদের উপর কথা বল। যেখানে পড়েছে, তার উপযুক্ত ক'রে তৈরি করতে হলে, ঘর নিকোতে, আর বাসন মাজতে শিক্ষা দেওয়া উচিত, পাড়া গাঁয়ের অবস্থাপন্ন ঘরেও যার চলন ; তারা তো মাষ্টারনি গিরি করাবার জন্যে ছেলের বিয়ে দেয়নি, যা বলব উচিত কথা।”—

ভূমেন্দ্রবাবু দাঁতে দাঁত দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, “হুঁ বটে, এবার থেকে গৌরীকে তোমার হাতেই সমর্পণ করব শিক্ষা দেওয়ার জন্যে।”—বলে অভুক্ত আহার্য্য সমেত চাঁদি রূপার মস্ত বগীথালাখানি তুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে চলে গেলেন। বাড়ির দাসী, চাকর, পুত্রবধু, পিসি, মাসী, ভগ্নি প্রভৃতি বহু পরিজন ব্যস্ত হয়ে এসে চারিদিকে চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে থাকল, কর্ত্তার আষাঢ়ের মেঘের মত মুখ দেখে আর কেউ কথা বলতে সাহস করল না।—

রবিবার সকাল থেকে প্রায় বারটা পর্য্যন্ত, ভূমেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানা

বন্ধুবর্গে গুলজার থাকে, এই দিন ছুটির বার, উকিল, এ্যাটর্নি, ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কেরাণী সবাই ছুটি ভোগ করেন. এই মজলিসে সব শ্রেণীর লোকেরাই প্রায় থাকেন, কারণ ; অধিকাংশই গৃহস্বামীর বাল্যবন্ধু ; দুজন চাকর ঘন ঘন চার পাঁচটা গড়গড়ায় সুগন্ধি তামাক যোগাচ্ছে, ও নানা ফরমায়েস খাটছে। তাস, পাসা, দাবা, গান, বাজনা, গৃহচর্চ্চা, পরচর্চ্চা, দেশ বিদেশের চর্চা সবই এই মজলিসে এঁদের চলে ; সেদিনও চলছিল। প্রায় বেলা দশটা, এমন সময় গৌরী এসে পিতামহের পিঠের দিক গিয়ে গলা জড়িয়ে তাঁর পিঠে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ; তিনি যতই বলেন, "গৌরী, কি হয়েছে তোমার, আমার সামনে এস দেখি কে তোমায় বকেছে, মেরেছে।" গৌরী ততই ফুলে ফুলে কাঁদছে, বিব্রত হয়ে তিনি দ্বারের দিকে দৃষ্টি করে দেখলেন, গৌরীর পিছু পিছু অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এসে বৈঠকখানার দালানে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তদোর অধিকাংশই এই বন্ধুদের ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনী। তাদের অগ্রণী হয়ে করুণ সজল নেত্রে গৃহস্বামীর পৌত্র ছয় বছরের খোকন দিদির দিকে চেয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ভূমেনবাবু "হ্যাঁরে দিদিকে কে মেরেছে রে খোকন ?" সে বলল, 'মা'। ভূমেনবাবু বললেন, "কি বৌমার এত সাহস, আমার দিদুর গায়ে হাত দেয়, দেখছি আমি গিয়ে ; তুমি এস তো ভাই ! কোথায় মেরেছে দেখি আমি, কি করেছিলে তুমি, কিসে করে মেরেছে তোমায় ?" গৌরী উত্তর দিল না. খোকন বলল "চোখে করে মেরেছে মা,।"

একথা শুনে ঘর শুদ্ধ হেসে উঠল সকলে, তাদের চোখের ইসারায়

থামিয়ে ভূমেনবাবু বললেন, "দিদি কি করছিল, 'মা' কোথা থেকে চোখে করে মেরেছে বলতো ভাই ?"

খোকন বলল, "দিদি আমাদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিল, তাই মা দোতলার খড়খড়ির ভেতর থেকে চোখে করে মেরেছে।"

আবার ঘরে চাপা হাসির স্রোত বহিল। তখন ভূমেনবাবু আদর করে নাতনীকে ডাকলেন, "দিদু তুমি এ ধারে এসতো ভাই, মা'য়ের তোমার হচ্ছে, তাই আজ বাড়ির ভেতর; কিন্তু তুমি কি কথায় অবাধ্য হয়েছিলে ভাই, বলতো আমায়।"

গৌরী এবার চোখ পুঁছে সামনে এসে বললে, "মা খালি খালি বলে, "তুমি রাস্তায় যেও না, যেতে নেই, মাথায় সিঁদুর পরলে মেয়েদের আর রাস্তায় যেতে নেই; আমি এই বিচ্ছিরি সিঁদুর পরতে চাই না দাদামণি, তবু আমায় কেন জোর করে পরাবে ? আমিই শুধু রাস্তায় যাব না কেন ? অনুদি, মনুদি, প্রভাসদা, লিলি, শিলি সবাই তো রাস্তায় যায়, কেন আমিই যাব না ? একবারটি কলের কাছে গেলেই মা অমনি বকবে।"

ভূমেনবাবু মাথা চুলকে ভেবে নিয়ে বললেন, "কি জান ভাই, মা' যা বলেন, তার মানে হচ্ছে এই, ওরা তো' আর কেউ-ই তোমার মত ভাল মেয়ে নয়, তোমার মত অমন চমৎকার কি গান করতে পারে ওরা, তুমিই বল না ?"

গৌরী ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ নিশ্চয়ই না! ভূমেনবাবু আবার বলতে লাগলেন, "তবে যারা ভাল মেয়ে, তাদের রাস্তায় বেরুতে এই জন্যে বারণ যে, চোরে তাদের চুরি করে নিয়ে যেতে পারে, ওদের তো

আর নেবে না ভাই, তুমিই বল না, সেদিন গোল দীঘিতে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গেছলুম, আর সেই লোকটা কেমন তোমাকে এসে ভুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, ভাগ্যে রঘুয়া সঙ্গে ছিল, তাই খুঁজে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে এল, না হলে কি হত বল দিকিন? আমি এই বুড়ো মানুষ কি তোমায় খুঁজে বের করতে পারতুম? ততক্ষণ ঐ লোকটা তোমায় কোথায় লুকিয়ে ফেলত। সেই লোকটা যেই তোমায় বলেছে, "এই খুকী আমায় সাদী করবি আয়," অমনি তুমি এমন বোকা যে তার পেছু পেছু চলে গিয়েছিলে। তেমন ধারা যদি আবার হয়, তাইতো মা' বারণ করে, ওরাও তো সেদিন সঙ্গে ছিল, ওদের কি অমনি নিয়ে গিয়েছিল, বল না?"

গৌরী চুপটী করে রইল, তার ঐ সব ঘটনা মনে পড়ে গেল, ও মুখটী শুকিয়ে গেল।.........

গৌরীকে বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত দেখে ভূমেনবাবু বললেন, আচ্ছা, আমি রোজ তোমায় বৈকালে আমার নতুন গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যাব, কেমন? তাহলে হবে তো?"

গৌরী বললে, "আচ্ছা তাহলে শুধু তুমি, আমি; ওদের নিলে হবে না কিন্তু ওরা রাস্তায়ও বেরবে আবার নতুন গাড়ি চড়ে বেড়াতেও যাবে, তাহলে কিন্তু আমিও তোমার গাড়িতে বেড়িয়ে এসে, ফের রাস্তায় বেরব।"

গৃহস্বামীর একটী বন্ধু মহেন্দ্রবাবু বলে উঠলেন, "দেখেছ ভূমেন, গৌরীর বুদ্ধি, ওকে কেউ চট্ করে ঠকাতে পারবে না।"

ভূমেনবাবু উত্তর দিলেন, "হাঁ কেউ ওকে ঠকাতে পারবে না, বটে,

বুদ্ধির জোরেও বুঝতে পারবে যে, "আমায় ঠকাল" কিন্তু বুঝেও বুঝতে চাইবে না, অর্থাৎ "প্রতিবাদ" করবে না, বা 'প্রতিশোধ' নিতে চাইবে না ; সাধারণের মত এতে তার আসে যায় না ; অতএব বুঝেও বুঝতে চাইবে না, সব কিছুকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করে ; এই রকম ভাবের শিক্ষা ওকে আমি দিয়ে যাব, সবাই বলে একটা মেয়ের পিছনে অত টাকা খরচ কেন করা, একি ছেলে যে সার্থক হবে। কিন্তু মেয়েও যে মানুষ, সেই যে একজন মহামানুষের সৃষ্টির আধার, তা তাদেরই মা, ঠাকুর মাকে, যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝাতে হয়, এমনই আমাদের অন্তঃপুরের কুশিক্ষার ফল। শিক্ষার যে "সুফল" তা অশিক্ষিতকে বোঝাবার মত ঝকমারি আর নেই। এই নিয়ে তর্কের জ্বালায় কাল রাত্রে খাবার উল্টে ফেলে দিয়ে উপোস দিয়ে রাত কাটিয়েছি।

'তখন মহেনবাবু', রমেশবাবু বললেন, "কার সঙ্গে হে কার সঙ্গে ? বৌমার সঙ্গে নিশ্চয়ই নয়, সে ঐ বোধ হয় তোমার নূতন গৃহিনীর সঙ্গে কেমন ?

ভূমেনবাবু বললেন, "হাঁ বোঝে নাতো কিছু, ক'য়ের আঁকড়ি কাটতে জানে না, কাজেই মেয়ে মানুষের পিছনে অতগুলো মাষ্টার রেখে খরচ করে কি হবে, কৈফিয়ৎ চায়।"

তখন সবাই বলে উঠলেন, 'আমাদের বাড়িও তাই হে, মেয়েদের শিক্ষার পিছনে খরচ বেশী দেখলে, তাদের মায়েরাই বেশী রেগে উঠেন, ভাবেন, ও টাকাটা ছেলেদের পিছনে দিলে জমার ঘরে যেত, মেয়েদের শিক্ষার পিছনে দেওয়া মানেই জলে ফেলা ; তবে তোমার বৌমার বাবা সাহেবী ষ্টাইলে থাকেন, বৌমা শিক্ষিতা, তিনি কখনই অমন

কথা বলবেন না, না হলে তিনি অমন লোকের মেয়ে, বাবা তো দু'বেলা মেয়ে নিয়ে যাবার জন্তে ধর্না দিচ্ছেন, মেয়ের এমনই সুশিক্ষা যে, সৎ শাশুড়ী ও তার গুষ্টিবর্গ নিয়ে ঘর করছেন, তবু বাপের বাড়ি যেতে চান না, এক দিনের জন্যও। একি সাধারণ মেয়েরা করত ?"

ভূমেন্দ্রবাবু বললেন, "নাঃ আমার বৌমার মত মেয়ে সংসারে সুলভ নয়, তা জানি। তবে কি জান ? শ্বশুর বাড়ির গুষ্টিবর্গই বল, আর নূতন গৃহিনীই বল, সবাই বৌমার তাঁবে থাকে। দোতলায়ই "ক্যাস" সব বৌমার হাতে দিয়ে তবে আমি তেতালায় উঠি। তারপর একটা পয়সা তাও আমার হাত পেতে বৌমার কাছে চাইতে হয়, তা নতুন গিন্নি তো কোন্ ছার। কিন্তু দেখ ভাই, আবার বিয়ে করে সংসারে মন বসাবার জন্তে তোমরাই বেশী ক্ষেপিয়েছ, আবার এখন তোমরাই উঠতে বসতে ঠাট্টা কর ; আরে বিয়েই যখন করেছি, তখন শ্বশুর, শালা, শালী সবই তো আমার, তাদের মান ইজ্জতের সঙ্গে আমিও জড়ীভূত। কাজেই অবস্থাহীন তাদের আমি আশ্রয় না দিয়েই বা করি কি, তাই বলো ? তাই বলে বৌমার অমর্য্যাদা করে কার সাধ্য, বৌমাই তো এ সংসারের সব ; কি দুঃখে তিনি বাপের বাড়ি গিয়ে পড়ে থাকবেন ? জমিদার ভূমেন্দ্রনারায়ণ পালিতের পৌত্র পৌত্রী মামার ভাতে মানুষ হবে, এই কি একটা কথা হল হে, তা হোক্ না মামারা ধনী, মানী, সেটা মামার বাড়ি তো বটে ?"

বন্ধুরা ভূমেন্দ্রবাবুকে উত্তেজিত দেখে বলে উঠলেন, হাঁ তাতো ঠিক ঐ ছেলে মেয়েরা যে তোমার প্রাণ, তাকি আর জানি না ভাই, তবে কি জান প্রথম প্রথম সবই থাকে, পরে দ্বিতীয় পক্ষের হাতে

একেবারে ভেড়া বনে যায়, তখন হয়তো লক্ষপতি ক্রোড়পতির ছেলে-মেয়ে পথের ভিখারীতে পরিণত হয়। কারণ, বাপ ঠাকুরদাদা তাদের দ্বিতীয় পক্ষের হাতে আত্ম সমর্পণ করেছেন; এ আমি উকিল মানুষ কত দেখছি রোজ, কিছু মনে কর না ভাই, কিন্তু শেষটা যেন রক্ষা হয়," রামবাবু এই কথা বললেন।

ভূমেনবাবু বললেন, "আচ্ছা হে আচ্ছা, সে দেখতে পাবে। তোমরা গাছে তুলতেও যেমন, মই কাড়তেও তেমন। কিন্তু তোমরা জান না বোধ হয় আমার বৌমা কি প্রকৃতির মেয়ে; বৌমার বাবার সঙ্গে গৌরীর বিয়ের পর থেকে আমার একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, চিঠি পত্র তো নয়ই; বৌমা কিন্তু আমার পক্ষে; বাপের বাড়ি গেলেও আমার নাতী নাতনী নিয়ে যাবার হুকুম নেই সেই থেকে, তিনি তাই একলাই যান, এমন লক্ষ্মী মেয়ে।"……

সবাই বলে উঠল, "কেন, কেন? গৌরীর বিয়েয় তার মামারা কেউ আসেনি. বটে কি কারণটা কি?"

ভূমেনবাবু বললেন, বৌমার বাবা সাহেবী ফ্যাসানের লোক জানই তো? আমায় লিখলেন, "গৌরীর বিয়ে দেবার দরকার নেই, ওর ঠিকুজি কোষ্ঠী ভারি খারাপ, ও এখন পড়া শুনা করুক। আমার মত না নিয়ে কখন ওর বিয়ের চেষ্টা করবেন না।" সেই-ই আমার অষ্টম বর্ষে গৌরীকে "গৌরীদান" করার আসল কারণ। কি জানি, যদিই আমার ভাল মন্দ কিছু হয়, ঐ সাহেব লোক সত্যিই হয় তো তাই করে, আমার পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করবে। আমার নাতী নাতনীর উপর হুকুমজারি করতে আসেন তাঁর এতই সাহস, দেখি, আমার নাতী

নাতনীর উপর তাঁর কর্তৃত্ব 'করার কতখানি সাধ্য আছে। না হলে হয়তো এত শীগ্‌গির গৌরীর বিয়ে আমি দিতুম না, কি রকম জেদীবংশ আমাদের জান তো? রাগলে আর জ্ঞান থাকে না; কিন্তু কি জান ভাই, "গৌরীর কোষ্ঠী বড় খারাপ" এই একটী কথা যেন সর্ব্বক্ষণ আমার কাণে বাজে। জান আমি ওসব বিশ্বাস করি না, ঠিকুজিকোষ্ঠী মিলিয়ে কোন কাজ কখন করিও নি, তবু যদিই তাই হয়, গৌরী যেন নিজেকে নিজেই রক্ষা করতে পারে এইভাবে ওকে আমি শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই। কি জানি হয়তো ভাল করি নি, এখন থেকেই নানা কাজে যেন গৌরীর শিশু মনকে পীড়ন করা আরম্ভ হয়েছে। ভাগ্যকে কেউ কোন দিন লঙ্ঘন করতে পারে না, যা' হবার তা' হবেই, ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে জানি না তো? মস্ত কুলীন, মস্ত ঘর এই সবই আমার তখনকার জেদী মনকে ধাঁধিয়ে দিল, কিন্তু পাত্রটী তো সুবিধার নয় মোটেই, তখন জেদে পড়ে যেন অন্ধ হয়ে গেছলুম। যাক্, যা করেছি তার উপায় নেই, "জন্ম; মৃত্যু, বিয়ে, এ তিন বিধাতা নিয়ে," তবে যেটুকু আমার হাতের মধ্যে আছে, তাই করে যতদূর পারি প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করব।"

বন্ধুরা মুচকে হেসে বললেন, "পারবে কি দাদা, শেষ অবধি নতুন সংসার, তায় আবার চাঁদপানা ছেলে হয়েছে, এরপর আবার ঐ দুলাল চাঁদের ভাবনায়ই মাথা বোঝাই থাকবে, আর কারো চিন্তার স্থান সেখানে থাকবে কি ভাই?"

এবার সুরসিক ভূমেনবাবু হেসে বললেন, "কেবলই নতুন গিন্নি আর চাঁদপানা ছেলের নাম করে করে আমায় দেখছি পাগল করে দেবে,

বলি, অত মধুর নাম শোনাচ্ছ কেন হে আজ? ভীমনাগের দোকানে অর্ডারটা পাঠাব নাকি? বলি, ও দুটী জিনিষ যে আমার নীরস জীবনকে সরস করে রেখেছে সেতো তোমাদেরই দয়ায় হে, নাহ'লে এতদিন হিমালয়ের গিরিগুহায় লোটা কম্বল নিয়ে কবেই তো বে রিয়ে পড়তুম. এই নাবালকের ও বিষয়ের ট্রাষ্টি তোমাদেরই করে, কেমন না?"

তখন বন্ধুরা সবাই হেসে উঠল, বলল, "আরে ভায়া তোমার অদৃষ্টে এখনও রাজ্য ভোগ লেখা রয়েছে, তুমি মোক্ষলাভ করার চেষ্টা করবে কোথা থেকে যা হোক আজ বেলা তো গেল হে উঠি সব, ভীমনাগের অর্ডারটা আসছে রবিবারের জন্য পাঠাও, আমরা সেদিনও তোমার কাণ ভরে মধু নাম শোনাব। উপস্থিত ওবেলা ভবানীপুরে তো যাচ্ছ বটে, সেখানেই আবার দেখা হবে, ক্ষিতীশের বাড়ি গানের মজলিশে নিমন্ত্রণটা মনে আছে তো? তোমার গৌরীকে কিন্তু নিয়ে যেতে ভুল না, না হলে বন্ধুবর রাগ করবে, জান তো গৌরীর গানই মজলিসে আগে হয়?"

ভূমেনবাবু বললেন, "হাঁ হাঁ মনে আছে খুব, গৌরীকে নিয়েই যাব, এস সব তাহলে।"

বৈকালে ভূমেন্দ্রবাবু গৌরীকে লইয়া ভবানীপুরে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন অন্যান্য বন্ধুরা সকলেই ইতিমধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই সকলের শেষে আসিলেন। আসর সন্ধ্যায় বসিবে, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা সেই সময়েই আসিবেন। কিন্তু বন্ধুদের বেলায় সে নিয়ম নাই, তাহারা বহু পূর্ব্বে আসিয়া

আড্ডা দিবেন এবং বন্দোবস্তর ত্রুটী কিছু হইতেছে কিনা, তদারক করিবেন, কাজেই বহু পূর্ব্বেই তাঁহাদের আসা বরাবরের নিয়ম।

গৌরীকে দেখিয়া পিতামহের বন্ধুরা সকলেই উৎফুল্ল হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন, "এস এস গৌরী দিদি এস, এতক্ষণ এখানে তোমার কথাই আমরা ভেবে ভেবে চৌদ্দ ছিলিম তামাক পুড়িয়ে ফেললুম। তারপর আজকে যে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায়, এমন চমৎকার সাজে কে সাজিয়ে দিল?"

গৌরী লজ্জিত মুখে উত্তর দিল, "মনোদি।" আর গৃহস্বামী ক্ষিতীশবাবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর অমন চমৎকার গোলাপটী কার জন্মে হাতে করে নিয়ে এসেছ ভাই?"

গৌরী উত্তর দিল না, মিটি মিটি হাসিতে লাগল।

তখন রমেশবাবু বললেন, কার জন্যে আবার, এই আমাদেরই ভেতর সব চেয়ে গৌরী যাকে পছন্দ করে ভালবাসে, তাকেই ঐ ফুলটী দেবে, না' গৌরী?"

তবু গৌরী উত্তর দেয় না. এবার পিতামহর দিকে চেয়ে তেমনি হাসিতে লাগিল।

তখন রামবাবু বললেন, "ভাল তো ও দাদুমণীকেই বাসে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী; ভালবাসার খাতিরে ফুল দিলে তো আর চলবে না, এই আমাদের ভেতর সব চেয়ে কে সুন্দর দিদুর চোখে বাচাই করে নাও আজ।"

তখন ভূমেনবাবু পর্য্যন্ত যোগ দিয়ে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠিক কথা, গৌরী, আমাদের এই সভার মধ্যে সব চেয়ে যাকে সুন্দর বলে

তুমি মনে কর, তাকেই ঐ ফুলটী দাও, দেখি তোমার কেমন পছন্দ।"
তখন সকলেই অমলেন্দুবাবুর দিকে চেয়ে হাসলেন ও বললেন, "আজ তোমারই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন ভাই, গৌরীর হাত থেকে ফুলটী তুমিই পাবে দেখছি, কারণ আমাদের মধ্যে তুমিই তো সেই হংস মধ্যে বকোযথা, তাছাড়া তোমার কাঁচা সোণা রং, ফ্যাসান দুরস্ত পোষাক, পরিচ্ছদ, যায় তোমার গাড়িখানার রংয়ের পর্য্যন্ত দিচ্ছ চিরদিন ভক্ত, অতএব আমাদের এই প্রস্তাব তোমারই সোনায় সোহাগা হে, এটা ফাল্গুন মাস নয়? 'তা ফাল্গুনে ডাকল কোকিল, সে হল তোমার উকিল,' বুঝলে ভায়া, আজ এখানে এসেছি, আসছে রবিবার তোমার বাড়ির নিমন্ত্রণটা দেখছি অনিবার্য্য।"

অমলেন্দুবাবু হাসতে লাগলেন, বাস্তবিক তাঁর চেহারা ভারি সুন্দর, বাঙ্গালীর ছেলেদের সে রকম রং চট্ করে দেখাই যায় না, সভার মধ্যে ফর্সা রং আরও অনেকে আছেন বটে, কিন্তু ওঁর কাছে লাগে না।

গৌরী কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়েই আছে, লজ্জিত মুখে—

তখন সকলেই বললেন, সে কী গৌরী তুমি কি আমাদের মধ্যে সুন্দর কারুকেই দেখছ না, তাই দিতে পারছ না বুঝি? তবে বুঝি ঐটি রেখে দেবে, সেই চমৎকার সুন্দর আমাদের নাত জামাইটীর জন্যে, সে এলে বুঝি তাকেই দেবে? কি বল গৌরী?"

এবার গৌরী বলল, 'ধ্যেৎ রেখে কেন দেব!'

ভূবেনবাবু বললেন, তবে যে তোমার কাছে সুন্দর লাগে তাকে দাও, আমাদের ভেতর কে সব চেয়ে সুন্দর তোমার চোক্ষে তার পরীক্ষা হয়ে যাক।'

তখন গৌরী সবার দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখল, তারপর একটু যেন কি ভাবল, তারপর বরাবর এগিয়ে গিয়ে সব শেষের যে চেয়ারে ক্ষিতীশবাবু বসে আছেন তাঁরই হাতে গিয়ে ফুলটী দিল।

তখন সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাসির শব্দে ঘর যেন ফেটে পড়ল।

গৌরী ভয়ানক থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি এসেই পিতামহের কোলের মধ্যে মুখ লুকাল।

হাসি থামলে ভূমেন্দ্রবাবু বললেন, 'বাবা সাধে কি আর নাত জামাই করেছি অমন পাকা রংয়ের, তোমরা আমায় দোষ দাও, দেখছ দিদুর কি রকম পছন্দ, ও'রং বাবা পাকা বানিশ, রদ্দুরে চটবে না; তা'না' হয়ে তোমাদের ঐ ক্ষণস্থায়ী কটা রং কি আর বুদ্ধিমান লোকে পছন্দ করে হে. বোঝ একবার আমার বুদ্ধিটা কি রকম, গৌরীর মন বুঝে আমি কতখানি চলি।'

তখন অমলেন্দুবাবু বললেন, 'হ্যারে গৌরী ও ফুলটী যে আমারই প্রাপ্য, আমায় বঞ্চিত করে ও কাকে দিলিরে ভাই? দেখ এখনও ভাল চাস তো কেড়ে নিয়ে আমায় দে, ছেলে মানুষ ভুল করা তো আর আশ্চর্য্য নয়, য়্যা গৌরীর হাতের ফুল পেল কিনা শেষটা ক্ষিতীশ'—বলে গান ধরলেন, 'হায় সখি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।'

ভূমেনবাবু গান ধরলেন, "তুমি ভুল কর না পথিক করি মিনতি;"

এদিকে কাণ্ড দেখে গৌরীর চোখে জল এসে গেছে, সে প্রাণপণে পিতামহের কোলের ভিতর মুখ লুকিয়ে আছে।

তখন ক্ষিতীশবাবু উঠে এসে গৌরীকে আদর করে তুলে নিজের কাছে নিয়ে এলেন, ও বললেন, 'তোমরা চুপ কর, আমি এবার ওর সঙ্গে কথা বলব।'

তখন সবাই হাসিমুখে বললেন, 'হাঁ হাঁ, তাতো বলবেই, আমরা এই চুপ করলুম।'

ঐ ক্ষিতীশবাবুরই এই সভার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিরেশ রং, তাই গৌরীর এই অদ্ভুত ব্যবহারে সবাই হাসাহাসি করছিল।

ক্ষিতীশবাবু আদর করে গৌরীকে বললেন, 'তুমি ওদের কথায় কান দিও না, দিদু ভাই ওরা ভারি হিংসুটে, আমায় ফুলটা দিয়েছ বলে তোমায় ওরা কাঁদিয়ে ছাড়ল; কিন্তু আমি নিজেই যে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, তুমি আমাকেই 'সব চেয়ে সুন্দর' সার্টিফিকেট দেওয়ায়। এতো আমি আশা করি নি ভাই, এ যে আমার অযাচিত সৌভাগ্য। চল উপরে তোমার দিদির কাছে তোমায় নিয়ে যাই, বুঝুক যে গৌরীর মত মেয়েও আমায় 'সুন্দর' সার্টিফিকেট দেয়। সে যে বড় রূপের দেমাকে চোখে দেখতেই পায় না, এই বুড়া বয়সেও আমায় তো কোন দিন সুন্দর বলে নি। এতো করে মনোরঞ্জন করা সত্বেও চিরদিন তার মত রূপসীর কাছে আমি কুণ্ঠিত হয়ে কাটালুম, আর আজ কিনা এই সভার মাঝে অনায়াসে তুমি আমায় আশাতীত সম্মান দিলে। এর জন্যে আমি চিরদিনের জন্য, বুঝলে কিনা দিদু, তোমার কাছে কেনা হয়ে রইলুম। এখন তার কাছে যাবার আগে আমায় একবার বুঝিয়ে দাও তো দিদু যে, তুমি আমায় কেমন করে 'সুন্দর' দেখতে পেলে, এই দেখ না আমার হাত, আর ওদের

হাত, ওরা কত ফর্সা আমার চেয়ে, আর তুমি কিনা সব চেয়ে 'সুন্দর' বললে আমাকেই ; কেন' ?

গৌরী কথা বলে না, কেমন যেন ভাবতে লাগল, তারপর বলল, 'হাঁ ওঁদের হাত তো ফর্সা, আর আপনার হাত কাল, এই দেখুন আপনার চেয়ে আমার হাতও কত ফর্সা,—বলে ক্ষিতীশবাবুর হাতের উপর হাত দিল।

তখন ক্ষিতীশবাবু বললেন 'তবে ? তবে তুমি বুঝি দিদু ভুল করে আমায় দিয়েছ ফুলটা ? সত্যি কথা বল ? লজ্জা কি, আমি তো একটু আশা করি নি তোমার ফুল পাবার, অতএব যদি বল ভুল করেছ, একটুও দুঃখিত হব না আমি।'

গৌরী বলল, 'বারে, ভুল কেন করব আমি, ওঁরা বললেন, 'যাকে সুন্দর দেখবে সব চেয়ে, ফুলটা তাকেই দাও' 'ফর্সা যে তাকে দাও, একথা কি বলেছিলেন নাকি ?'

গৌরীর এই অভিনব কথায় সকলে আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, ভূমেন্দ্রবাবুর তো দুই চক্ষু কপালে উঠ্‌বার উপক্রম।

তখন ক্ষিতীশবাবু হাসিমুখে বললেন, বটে, ওরা ফর্সা আর আমিই 'সুন্দর', কী চমৎকার কথাই তুই বললি, দিদি, এই বুড়া বয়সে আমাকে কোন্ চোখে কখন তুই আমার মত কালোকে 'সুন্দর' দেখলি ভাই ?'

গৌরী হাসিমুখে, বলল 'কেন সেই যখন আপনি আপিস যান, তখনই আমি দেখেছি যে সব চেয়ে আপনিই সুন্দর।'

গৌরীর এই কথায় সবাই ভয়ানক চমকে গিয়ে উত্তেজনাবশতঃ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'ওরে বাবা এইটুকু মেয়ে শিশু বুদ্ধিতে

শিশুর চোখেও হাইকোর্টের জজকে চিনে, সভার মাঝে শ্রেষ্ঠ সুন্দর আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করল, কী আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমাদের মধ্যে ওর আসন যে কোথায়, বন্ধুত্বের বন্যায় আমরাই ভুলে যাই, কিন্তু ঐ শিশু কেমন করে চিনে নিল, ঐ কাল রং মস্ত গোঁফ, বিপুল চেহারার ভেতর 'সুন্দর'কে, কারও আর কথা নেই মুখে, সমস্ত চুপ।

ক্ষিতীশবাবুও ক্ষণেক আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, পরে একবার বন্ধুদের দিকে চেয়ে তাদের অবস্থাখানা দেখলেন, তারপরে গদ গদ কণ্ঠে বললেন, "গৌরী তুমি যে' সে মেয়ে নও, আমি যে গৌরবান্বিত পদে আছি, তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান আজ তুমি অজ্ঞান শিশু হয়েও আমায় দিলে, অন্য কেউ জ্ঞানবান লোক এই কাজ করলে অনেক কিছুই ভাবতে পারতুম আমি, কিন্তু নিষ্পাপ, সরল, পবিত্র শিশুর দিব্য দৃষ্টি আমায় আশ্চর্য্য করেছে,—বলে গৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "হাঁ দিদু, যখন তুমি আমায় সুন্দর দেখতে পেয়েছিলে, তখন আমার কাছে যাওনি কেন ?

গৌরী উত্তর দিল, "তখন কি যেতে আছে, যদি বকেন ?"

হাসিমুখে ক্ষিতীশবাবু বললেন, "এমন সর্টিফিকেট দেওয়াওলা লোককে কেউ বকে কখন ? কাল তুমি আমার সঙ্গে আফিস পর্য্যন্ত গাড়ীতে যাবে, আজ আমার এখানে থাকবে তোমার দিদির কাছে শুয়ে কেমন ?"

গৌরী সম্মতির ঘাড় নাড়ল, বলল "কিন্তু যদি মা'য়ের মন কেমন করে ?"

ক্ষিতীশবাবু বললেন, তোমার দাদুমণি মাকে বুঝিয়ে বলবেন, যে গৌরীদিদিকে আমি ছাড়ি নি।

তারপরে গৌরীকে কোলে নিয়ে অন্দরমহলে যাবার সময় ভূমেনবাবুর দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "ভূমেন তুমি কাজটা ভাল কর নি হে, এমন একটা সুন্দর শক্তি সম্পন্ন, গুণগ্রাহী অন্তরকে তুমি জিদের বশে অতল জলে ডুবিয়ে দিয়েছ। জানি না তোমার ঐ কাজের কি পরিণাম হবে ; এর ভবিষ্যৎ ভেবে আজ আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হচ্ছে ভাই।"

মাথা হেঁট করে ভূমেনবাবু বসে রইলেন, ও ঘরের প্রত্যেকে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

পূজিব তারে আমি কি দিয়ে ?

তাদের দুজনকে মানিয়ে ছিল কেমন, না ঠিক যেন পূর্ণচন্দ্রের পাশে ঘন কালো মেঘ। সবাই গম্ভীরভাবে স্ত্রী আচার প্রভৃতি বিবাহের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান শেষ করল। বিয়ের সে প্রাণঢালা আনন্দ হুলুধ্বনি এ বিয়েতে নেই। বরের আষাঢ়ের মত মুখ, সকলের সব কাজেই অসোয়াস্তি আনছিল ; কিন্তু 'কনের' সে কালো কচি কিশলয় তুল্য মুখে যেন স্বর্গের শোভা। এদের বিরাগ, অনুরাগ দেখার তার সময় নেই, সই পাওয়ার তৃপ্তিতে সে-মুখ উদ্ভাসিত। সে যে আশার অতীত পেয়েছে, এমনি আনন্দের আভা তার মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে।

বিয়ে হয়ে গেল, জ্যোতির্ম্ময় মলিনাকে গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় নিয়ে গিয়ে মায়ের পায়ে মাথা রাখল, বলল, "এইবার সব শেষ হল তো ? আমি যেতে পারি এখন ?"

মা ছেলের বিরস গম্ভীর মুখের প্রতি তাকিয়ে উত্তর দিলেন, "আজ, কাল, পরশু, এই তিনটে দিন কাটলে তবে বিয়ের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান শেষ হবে বুঝলে ? এখনই অত অধৈর্য্য প্রকাশ করলে চলবে কেন ?"

ছেলে উত্তর দিলে, "বেশ ; তারপর কিন্তু তুমি আমার কথা রাখবে, ওর মুখ আমি দেখছি না জীবনে কোন দিন ; আমার সামনে কখনও না পড়ে সে ব্যবস্থা করার ভার তোমার উপর ; এ বিয়ের নাম

পঙ্কও আমি ভুলে যেতে চাই। লেখা পড়া শিখে, জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক বিশিষ্ট মানুষ হয়ে এমন পশুর মত কাজ যে আমি করলুম, এ কেবল মাত্র তোমার কথায়। ঈশ্বর জানেন ওর টাকার লোভে ওকে স্ত্রী বলে দশের চোখে ধর্ম্মের নামে আমি স্বীকার করলুম না, করলুম স্রেফ তোমার আজ্ঞায়। তোমার হুকুম আমার যে কোন অবস্থায় ও যে কোন কার্য্যেই সর্ব্বদা পালনীয়, তবু এ একটা দারুণ অশান্তি; না হলে শাকান্নে পরিতৃপ্ত হয়েও লোকে মনের শান্তি খোঁজে, আর অর্থ ই সকল অনর্থের মূল। কত কষ্টেই না বিদ্যুৎকে বুঝিয়ে তবে এই বিয়ের ব্যাপারে রাজি করিয়েছি, তা আমিই জানি। সে বড় লোকের মেয়ে, দারিদ্র্যকে রীতিমত ভয়ের চোখে দেখে, তাই না একটু হের ফেরের জন্য অগাধ টাকার মালিক হওয়াতে সে আমায় বাধা দিলে না, না হলে বোধ হয় এত শীঘ্র এ কাজে আমি তোমার হুকুমেও যেতে পারতুম না। যতই হোক, বিদ্যুৎকে এনে তো আর দারিদ্র্যের ভীষণতার মধ্যে ফেলতে পারি না, কিন্তু লোকের চোখে আমি খেলো হলুম, সবাই বলবে টাকার লোভে ওকে বিয়ে করে ঘরে স্থান দিল শুধু।"

মা উত্তর দিলেন, "একটা ফুল ফেলার জন্য শুধু চার লক্ষ টাকা, আর কলকাতায় এতগুলো বাড়ি, এ কেউ ছাড়ে নাকি? মনের অশান্তি, বা শান্তি, এসব মানুষের নিজেদের সৃষ্টি বই তো নয়, কানা, খোঁড়া নয়, সকল বিষয়ে নিখুঁত সুশ্রী, কেবল রংটা কাল এই না? আর গুণ?—তা অমন গুণের মেয়ে পৃথিবীতে আর আছে কটা জানি না তো; আর এই তো সবে নতুন উকিল হয়ে বেরিয়েছিস, এখন কতকাল মক্কেলের জন্য ধর্ণা দিতে হবে কে জানে? পৈত্রিক বাড়িখানাও তো

মহাজনরা "হাঁ" করে আছে গ্রাস করবার জন্যে, এরকম অবস্থায় বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ, যে করছিল, সে তোকে কেবল ভালবাসার খাতিরে বিয়ে করত নাকি ?

ওসব মেয়ে আমার ঢের জানা আছে, ওরা আগে দেখে অর্থের দিকে; এইবার করনা বিদ্যুৎকে বিয়ে, তুমি আমার এক সন্তান, তোমার মনকষ্ট আমার সইবে কি ? নইলে মেয়েটা যা ভালবাসে তোকে, তার বুকের ওপর পাথর চাপাতে এত সহজে রাজি হতে পারতুম কি ? আমিও তো মেয়ে মানুষ ; এত বড় অত্যাচার করতে কি বুক কাঁপত না, কিন্তু কি দিয়ে যে বিধাতা এই মায়ের জাতটাকে গড়েছেন ? তাদের সব চেয়ে বড় ছেলে। নিজের ছেলের জন্য করতে পারে না এমন কোন কাজ মা'য়েদের নেই।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তা আর সাত দিন বাদেই যে দিনটা আছে শুনেছি, সেটাতেই বন্দবস্ত করতে তোর হবু শ্বশুরকে তুই বলে আয় গিয়ে, মাথার উপর কেবা আছে, তোর বিয়ের কর্ত্তা তো তুইই ; এর মধ্যে তোর ফুলশয্যার ব্যাপারটা মিটে গেলেই, ঐ বড় লোকের সুন্দরী মেয়েকে ঘরে আনবার আগে তার যোগ্য ঘর সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে ফেল। কদিন তাকে সঙ্গে করে ভাল জহুরীদের দোকান হতে অলঙ্কারপত্রের ও পোষাক পরিচ্ছদের যোগাড় করে ফেল ; দুজনে হাওয়া খাবে, তার ভাল দেখে একখান "মটর" কেন। বলি আসল জিনিষই হচ্ছে এই, এসব না হলে, তাকে এনে সুখের বদলে কষ্টই পেতে যে, আর তোমার এ শ্বশুর মেয়েকে কিরকম দেবেন, থোবেন, তার আভাষ পেয়েছ কিছু ?"

ছেলে উত্তর দিল, "না মা, দিতে তিনি কিছুই পারবেন না, আজ-কাল সে অবস্থা নেই তাঁর ; তাঁর মেয়েকেই আমি চাই, টাকা নয়।"

মা উত্তর দিলেন, "বেশ, তেতালার দু'খানা ঘর ছাদ বারান্দা নিয়ে তোমাদের থাকবার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে নাও। মলিনা ঐ দোতলার ওপাশের ঘরখানায় থাকবে এখন, তার যেমন নিজের হাতে গড়া ভাগ্য! যা' তার ঐশ্বর্য্য তার জন্য তো অনেকই রূপ-গুণ-সম্পন্ন পাত্র তার দিকে ঝুঁকেছিল, তার ভেতর হৃদয়বান্‌ও থাকতে পারত, কালে হয় তো ও যে কুরূপা একথাটা ভুলে যেত ; কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। তুই ওর স্বামী, অন্যকে "ও" চোখেও দেখল না, না হলে যখন তোর সইমা অসহায় দশবছরের বালিকাকে অগাধ ঐশ্বর্য্য সমেত আমার হাতে দিয়ে গেছল, তখনও আমি ভাবতে পারিনি ঐ কুরূপা মেয়েকে আমার এমন চাঁদের মত ছেলের বৌ বলে ঘরে তুলব। কিন্তু এই পাঁচ ছয় বছর ওকে কাছে পেয়ে বুঝেছি, ওকি রত্ন ; যত সম্বন্ধই আনি, কেবল কান্না, "মা আপনার কাছ থেকে আমি কোথাও যেতে পারব না, আপনার পায়ের তলায় আমায় একটু স্থান দিন"। সে কী কাতর প্রার্থনা! বললুম, "ওরে হতভাগী, ওযে তোকে দেখলে শিউরে ওঠে? এই ঘৃণার আওতায় তুই চিরকাল কাটাতে পারবি কেন?" তবু কিছুতেই শোনে না সেকথা, বলে, "না কাটালে চলবে না যে মা! আমি যে কোথাও যেতে পারব না, আমার মা যাবার সময় আপনাকে দেখিয়ে আমায় বলে গেছেন, "আজ থেকে তোমার সইমার বাড়িই তোমার আপন বাড়ি হল, ঐখানে তোমার চিরকালের আসন প্রতিষ্ঠিত হ'ক এই আশীর্ব্বাদ করেই আমি চললুম।"

আর আমাকেও তো ঐ কথাই সে বলে গেছল যে, "আমার মেয়ের অমূল্য গুণ ও অতুল ঐশ্বর্য্যেই তোমরা তার রূপের ত্রুটী মাপ করো ভাই"। সেই থেকে মেয়েটী সেই চোখেই তোকে দেখে আসছে, এমন লক্ষ্মী মেয়ে কোথাও দেখিনি, আমার বাড়িতে থাকে যেন চোর হয়ে, যেন কত অপরাধী। কে বলবে এত ঐশ্বর্য্যের মালিক এই! ওকে দেখলে লোকের মনে হবে আমাদের অনুগ্রহে ও বেঁচে আছে। আর কি সেবা যত্ন দিয়েই না ঘিরে রেখেছে তোকে, আমাকে। আমার তো একদণ্ড ওকে না হলে চলে না বাবা। সর্ব্বস্ব দিয়ে তোর বাড়ির এক-পাশে একটু স্থান বেছে নিল; ওর জীবন সার্থক সেই মঙ্গলময় করে দেবেন, যাঁর কাছে একমাত্র গুণেরই মূল্য পাওয়া যায়। ওর সঙ্গে কু-ব্যবহার করিস্‌নি বাবা, ও ভুলেও তোর পথে যাবে না; সে প্রকৃতির মেয়ে 'ও' নয়, তাকি এতদিন এক সঙ্গে ঘর করেও বুঝতে পারিস্ নি? এমন মেয়ে কোথাও তো দেখিনি। বিদ্যুতের সঙ্গে তোর বিয়েয় কীই যে উৎসাহ, কি রকম কি হবে না হবে তার রোজই আমার সঙ্গে ব্যবস্থা হচ্ছে; এমন মেয়ের সঙ্গেও যদি তুই অনর্থক কেবলমাত্র এই বাড়িতে ওর অস্তিত্বজনিত অপরাধে খারাপ ব্যবহার করিস্, তবে ভগবানের কাছে তোর মাপ নেই জানিস্। বিশেষতঃ সব কিছু সুখ সুবিধা ওর টাকাতেই ভোগ করবি যখন।"

ছেলে আর কিছু উত্তর দিল না, চুপটী করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শুধু।

মা ফিরে বধূর দিকে চেয়ে দেখলেন। হেসে বললেন, "কি মা এবার আমার বাড়ির লক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে তো? আর কোথাও

তোমায় যেতে হল না তো মা?" বধূ মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে সরে এসে শাশুড়ীর কোলের ভেতর মুখ লুকালো।

কয়েক দিন পরেই মহাসমারোহে রূপের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রাজরাণী বেশে বিদ্যুৎ এসে এ বাড়ির মালিকের গৃহ ও মন দুই দখল করল, তারপর একটানা আনন্দ উৎসবের স্রোত সে বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেয়ে চলল—সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর, বৈকাল। জ্যোতির্ম্ময় ও বিদ্যুৎ নিজেদের সৃষ্ট নূতন নূতন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে বেড়ায়। একপাশে কুরূপা মলিনাও তাদের আনন্দের অংশ নিঃশব্দে ভোগ করে, তাদের সে কথা মনেই থাকে না। মলিনা নামক একটী জীব এবাড়িতে আছে একথা কচিৎ কখন তাদের মনে পড়ে। তাদের কোন কিছু অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয়, এজন্য সর্ব্বক্ষণ মলিনার কান ও প্রাণ সজাগ থাকে। সকলের অলক্ষ্যে সে ওদের সমস্ত সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে ফেরে, নিজেকে প্রাণপণে তাদের চোখের আড়ালে রেখে।

সেদিন নিত্যকার অভ্যাস মত ভোরে ঘুম ভাঙতেই উঠ্‌তে যেয়ে মলিনার মনে পড়ল, আজ আর তার শীঘ্র উঠার তাড়া নেই, কারণ, আজ এ বাড়ির গৃহিনী তাঁর ভগ্নীর বাড়িতে কাল থেকে গিয়ে আছেন। সেই দুপুরে ফিরবেন কালিঘাট সেরে। অতএব আজ তাঁর পূজার যোগাড় যন্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজনে এখনি তাকে দরকার নেই। অলস নিশ্চিন্ততায় সে বিছানায় পড়ে রইল; এবং অভ্যাস মত ঈশ্বরের প্রণাম করতে গিয়ে তার মাথার উপর দেওয়ালে টাঙ্গান জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং করা ছবিখানার দিকে দৃষ্টি পড়ল।

কী সুন্দর সে রূপ, আজ যেন মনে হয় যে, কমল-আঁখি দুটী তার দিকে চেয়ে হাসছে সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ; মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে সে বলল, "হায়রে অভাগী কত শত জন্মের সুকৃতি তোর ছিল, তাই না ঐ ছবি মাথার উপর রাখবার অধিকার লাভ করেছিস্! নিঃসঙ্কোচে ঐ দিকে চেয়ে দেখতে আগ্রহ থেকে কেউ তোকে বঞ্চিত করতে পারে না, এতেও কি তুই সন্তুষ্ট নস্? এর বেশী চাইতে তুই সাহস করিস্?" তারপর সে বাহ্য জঞ্জাল বিরহিত হয়ে, বিদ্যুতের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে কল্পনার জাল বুনে চলল। আচ্ছা এই অসম্ভব, কি কোন রকমে তার জীবনে সম্ভব হতে পারে না? বিদ্যুৎ যে সেও তো সেই বস্তু। কিন্তু বিদ্যুতের পাওয়ার কণামাত্র পেলেই সে বোধ হয় জীবিত থাকেতে পারত না ; তাই ভগবান এই ব্যবস্থা তার উপর দয়া করে করেছেন। এই তো বিয়ের রাতে অনিচ্ছায় অপ্রসন্ন মনে তার হাতে যে ক্ষণেকের জন্য হাত রেখেছিল তাতেই সে জ্ঞান হারিয়েছিল। সেই বস্তু বিদ্যুতের মত যদি সে পেত সত্যই তবে সহ্য করতে পারত কি? তাকে বিধাতা অন্য ধাতুতে গড়েছেন ; ঐ বিদ্যুৎকে নিয়ে সুখের স্বর্গে তিনি বাস করুন, তাঁর সুখেই তার সুখ। তারপরে গুণ গুণ স্বরে গেয়ে উঠল, "তবে পরাণে দিয়েছিলে কেন গো ভালবাসা, রূপ না দিলে যদি বিধি হে ; পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া পূজিব তারে আমি কি দিয়ে।" এমন সময় দরজায় জোরে জোরে করাঘাত করে বাড়ির পুরাণ ঝি কাদু বলে উঠল, "দোর খুলুন গো বৌদিদিমণি, বাড়ীতে মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে যে। মলিনা তাড়াতাড়ি উঠে দোর খুলে বলল, "ওসব কি কথা

বলছিস্? কি হয়েছে?" কাদু প্রায় কেঁদে ফেলল, বলল, "ভোর বেলা থেকে দাদাবাবুর কলেরা হয়েছে বৌদিদিমণি! তখণি মাকে আনতে গাড়ী গেছে। ঐ মায়ের গলার আওয়াজ পাচ্ছি, এসে পড়লেন বুঝি, দু'তিনটে ডাক্তার ঘিরে রয়েছে, নতুন বৌদিদি তো মুচ্ছো যাবার মতন হয়ে আছে, তিনি দাদাবাবুর ঘরে ভয়ে ভাবনায় ঢুকতেই পারছেন না, তা সেবা করবেন। এখন কেইবা রুগীর সেবা করে, কেইবা তেনাকে দেখে বাবা? রোগ বলে রোগ, ও রোগের সেবা কি আর সহজ কথা! এখন মা এসেছেন বাঁচলুম, ডাক্তাররা "নাচ" না কি বলে, সেই যে গো রুগীর সেবা করে—তাই আনতে বলেছেন। আমি যাই একবার বৌদিদিকে খবর দিয়ে আসি। সে কাজটা তো আর কাদী ছাড়া কারু বুদ্ধিতে কুলোবে না; বলি যার ঘরে আগুন লেগেছে তাকেই আগে জানতে দে।"

মলিনা কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, এখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে ছুটল তেতলায়। সেখানে গিয়ে দেখল রোগীকে তখনই আবার একদল নূতন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করছেন। পাশের ঘরে আরো জনকয় ডাক্তার বসে আছেন ও বারান্দার এক পাশে বিবর্ণমুখে বিদ্যুৎ বসে আছে। শাশুড়ী তার কাছে দাঁড়িয়ে সরকারকে হুকুম দিচ্ছেন, এখনি আসন্ন-প্রসবা বধূকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দাও। বাড়ির ঝি দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে এখনই পাঠিয়ে দাও; এই সময় ওর দিকে মনোযোগ দিতে আমি পারি না। আর শীঘ্র দু'জন নার্স আনাবার ব্যবস্থা কর, বৌমা হয়।" এমন সময় মলিনা শাশুড়ীর কাছে এসে অতি সঙ্কুচিত কণ্ঠে

প্রার্থনা জানালো "মা নার্স কি না আনলেই নয় মা! আমি কি সেবা করতে পারি না ?"

"তুমি কি পারবে মা ঠিক ভাবে ? এসব কি অভ্যাস আছে তোমার ?" শ্বাশুড়ী উত্তর দিলেন।

মলিনা উত্তর করল, "মা পরকে দিয়ে কি আপন জনের ঠিক মত সেবা করান হয়, না তাতে তৃপ্তি পাওয়া যায় ? অভ্যাস আর কার থাকে, অসুখ এলেই অভ্যাস আসে। আপনি দেখুন না মা খানিকক্ষণ, যদি না পারি তখন না হয় নার্স আনাবেন।" মা উত্তর দিলেন, "দেখি ডাক্তাররা কি বলেন জিজ্ঞাসা করি। পরে এসে বললেন, "আচ্ছ এখন তুমিই তবে যাও মা, দরকার বুঝি পরে নার্স আনাব।"

মলিনা জ্যোতির্ময়ের ও বিদ্যুতের স্বপ্ন-স্মৃতি-ভরা ঘরে ঢুকল নার্সের বদলে সেবা করবার জন্যে।

তারপর সে কী সেবা,—সেবা ছাড়া তাকে আর কোন্ নামে অভিহিত করতে পারা যায়, জ্যোতির্ময় যখন রোগী। তারপর সেই আশাহীন রোগীকে ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে ফিরিয়ে নিয়ে এল, যেন সাবিত্রী যমরাজের কাছ থেকে অসাধ্য সাধন করে তার প্রিয়তমকে ছিনিয়ে নিল। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। ডাক্তাররা তো স্পষ্টই বললেন, "এ রোগী বাঁচবার একটু আশাও ছিল না, আশ্চর্য্য যে ভাল হল! এ কেবল অদ্ভুত সেবার গুণে। মানুষ মানুষের এমন নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে ভুলে গিয়ে সেবা করতে পারে, তা জানতুম না।"

জ্যোতির্ময়ও যেন কেমন এক রকম হয়ে গেল। মলিনা

একটু চোখের আড়াল হলেই সে কেমন অস্থির হয়ে উঠে ; আর কেউ কোন কাজ করতে এলে তার পছন্দই হয় না। সে মর্ম্ম মধু দিয়ে তৈরি ওষুধ পথ্য দিতে অন্য লোকে কোথায় পাবে? মাও ছেলের এ ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন, তাই বধুর ভেঙ্গে পড়া দেহ দেখেও তাকে বলতে পারলেন না যে, "তুমি আর রোগীর ঘরে না গিয়ে বিশ্রাম নাও। কি জানি সারবার পথে ছেলের তাতে যদি কিছু অনিষ্ট হয়, অসুবিধা ভোগ করে। আর ও অভাগীও বঞ্চিত তো সবেই, এটুকুতেও ও যদি শান্তি পায় তো পাক।

কিন্তু দেহের উপর এত অত্যাচার প্রকৃতি বরদাস্ত করলেন না। মলিনাও ঐ কাল ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হল। তখন সে সর্ব্বাগ্রে শাশুড়ীকে বলল, "মা এই সারবার মুখে কোন চিন্তা ঐ দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারবে না। আমার অসুখের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেবেন না, শুধু এই কথা বলবেন, "তুমি তো এখন সেরেছ, সে আর সে জন্যে আসতে চাইছে না। এখন অপরকে দিয়েও অনায়াসে তোমার সেবা চলতে পারে, এই কথাই সে বলেছে।"

মা অগত্যা ছেলের জন্য অন্য লোকের ব্যবস্থা করে দিয়ে ছেলেকে ঐ কথাই বললেন, "জ্যোতির্ম্ময় ক্ষণেক গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল, পরে বলল, "ওঃ এই কথাই বলেছে বুঝি, আচ্ছা ঐ আমার অসুখের বাড়াবাড়ির সময়ে ওকে দিয়ে সেবা কেনই তোমরা করিয়েছিলে, বলত? পয়সা দিয়ে কি নার্শ পাওয়া যেত না? ওর উপর আমি অবিচার করেছি, ও আমায় সুচক্ষে দেখতে পারে কখনো? তবে সেবা করিয়ে ওর উপর ঐ অত্যাচার করার আমাদের কি অধিকার

আছে ? ধরতে গেলে এক রকম ওর দয়াতেই আমি প্রাণ পেলুম এই তো ?

মা উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই বাবা, নার্সের কি সাধ্য অমনি প্রাণ ঢেলে সেবা করবার, ডাক্তাররা সবাই বললেন, "ওর সেবাই তোমার প্রাণ দিল।"

জ্যোতির্ম্ময় গম্ভীর মুখে বলল, "আমি এখন এতই সেরে গেছি, যে যার তার—অানাড়ীর হাতে আমায় ফেলে দিয়ে নিজে সরে গেল, এটা খুবই উচিত কাজ বটে!"

মা কি উত্তর দেবেন ? নির্ব্বাকে চলে গেলেন শুধু।

পরদিন রাত তখন বারটা হবে, সেই মাত্র ছটফট্ করে জ্যোতির্ম্ময় ঘুমে একটু আচ্ছন্ন হয়েছে ; সারা দিনটাই কেমন যেন, প্রাণ তার ছট্‌ফট্ করছে ; কী যেন কোথায় একটা অমঙ্গল তাকে ঘিরেছে। ঘরের আনাচে কানাচে তারই ছায়া। কে জানে বিদ্যুৎ কেমন আছে! ঐ তার শরীরের অবস্থা ; সে এমনি ভীতু যে অসুখ দেখে ঘরে ঢুকতে পর্য্যন্ত পারে নি, তার সেবা করবে! মা বলেন, "আমি তোকেই দেখি, না ওকেই দেখি" ? নাঃ বিদ্যুৎ আমার বড় কোমলপ্রাণা। যেমনি তার মাখমের মত কোমল শরীর, তেমনি কোমল প্রাণ। সে আমার ঐ রোগ-যন্ত্রণার কাতরতা সইতে না পেরে মূর্চ্ছাহত হয়ে গিয়েছিল ; আচ্ছা, আমি যদি এমন বড়লোক না হতুম, তবে বিদ্যুতের অমন ব্যবহার কি আমায় মরণের মুখে আরও অগ্রসর করে দিত না ? না থাক, এসব কি ভাবছি ? তখন বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই আমায় দেখত। আমি ছট্‌ফট্ করতুম আর বিদ্যুৎ বাপের বাড়ি চলে যেত, এই নাকি

আবার হতে পারে কখনো ? মা আছেন, অর্থ আছে, বিশেষতঃ সেবা করবার জন্য একজন পরমাগ্রহে এগিয়ে এসেছিল দেখে তবেই না সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পেরেছিল ! কী ভালই না বাসে আমায় সে; আমি কি জানি না ?

কিন্তু এই মলিনা ? একি আমায় ভালবাসে একটুও ? মাতো বলেন, ভারি ভালবাসে, কিন্তু সে পূর্ব্বের কথা। এই কয় বছর ধরে যে হৃদয়-হীনের মত ব্যবহার আমি করেছি তাতে মানুষ কি কখন ভালবাসতে পারে ? না, না, কখনই না। দেখছি না, একটু সারতে না সারতে সরে গেল সামনে থেকে। কিন্তু নাঃ সন্দেহ হচ্ছে। সে যে কী সেবা আমি তো জানি,—এত ভালও লাগত তাকে তখন, যে বিদ্যুৎকেও কখন অত ভাল লাগে নি। সে যেন কী একটা স্বর্গের জিনিষ ; তার চাহনীর অমৃত পরশেই যেন আমার অর্দ্ধেক রোগ-যন্ত্রণার অবসান হত। রংটাই যা ময়লা, কিন্তু কী করুণ কোমল সে স্বপনমাখা চোখ দুটী ? মনের বিরাগে কখন তো ভাল করে চেয়ে দেখি নি। নাঃ, আমার মত হত-ভাগার হাতে না পড়লে নিশ্চয়, ও নিশ্চয়ই সুখী হতে পারত। অমন গুণের আদর করবে না এমন লোক সংসারে কটা আছে ? সাধে কি মা মলিনার নামে গলে যান ? এই মলিনা আমায় যা দিল, বিদ্যুতের সাধ্য নেই কোন দিন তা আমায় দিতে। ভাগ্যে না এই অসুখটা হয়েছিল, তাই অমন রত্নকে চেনবার সুযোগ পেলুম। কিন্তু এ তবে কি, অভিমান নয় তো ?—যে "এখন তো তুমি সেরেছ, আর তোমার চক্ষুর পীড়াদায়ক হতে কেন যাই"। তাই নয় তো ? এক দিন তো তার সাক্ষাতেই মা'কে সে কথা বলেছিলুম, "কখন যেন আমার

সামনে না আসে"। সে কথা শুনে সে মুখের কি ভাব হয়েছিল চেয়ে তো আর দেখি নি, অভিমান হবে নাই বা কেন? এই বিদ্যুৎও যে সেও তো তাই. তার চোখের উপর যেভাবে বিদ্যুৎকে নিয়ে আমি থাকি, একী কেউ সহ্য করতে পারে? নাঃ কাল সকালে একটীবার ডাকাব তাকে. যাই হোক এই সেবাটা যে করল এর জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত; বলব, "আর কটা দিন না হয় দয়া করে আমার ভারটাই নিলে, ইচ্ছে করেই যখন এসেছিলে সেবা করতে।" .আচ্ছা, একথা শুনে মুখের ভাবটা কি রকম হবে? নাঃ, মনের ভাবটা বেশ সুবিধার লাগছে না তো, এর পরে এই নিয়ে বিদ্যুতের সঙ্গে একটা খিটিমিটি .লাগবে না তো? আমার মন এই যে ছেলে মানুষের মত মলিনার মিষ্টি হাতের সেবা চাইছে, এর মধ্যে নিছক অসুবিধাটাই আছে, না তাকে ভালবেসে ফেললুম? কিন্তু সে সব কথা এখন থাক, সমস্ত দিন মন খারাপ, ঘুম আসছে না, কিছুতেই; আঃ অসুখের সময় মলিনা কি সুন্দর নরম হাতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সারারাত জেগে কাটাত, আমি সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম, এই সব আবোল-তাবোল, ভাবতে ভাবতে সবে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে, মায়ের কান্নাভরা গলার আওয়াজে তার ঘুমের চট্‌কা ভেঙ্গে গেল, সে খড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল, যে এত রাতে মা' কেন তাকে কাঁদতে কাঁদতে ডাকছেন।

তাকে উঠতে দেখে মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বাবা, একটীবার নিচে নেবে চল, সে হতভাগী দোরের পানে চেয়ে প্রাণটুকু এখনও রেখেছে।"

জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কি হয়েছে মা খুলে বল না ?"

মা বললেন, "বাবা, মা আমার তোমায় ভাল করে তোমার রোগ নিজে নিয়েছেন; কাল রাত হতে তো শত চেষ্টা করলুম বাবা, কিছুতেই মা'কে আমার ফেরাতে পারলুম না। তাই মা আমার আজ তোমার সেবা করতে একবারও আসতে পারে নি এ ঘরে। আর আমায় অনেক করে বারণ করেছিল, তাই তোমায় জানাই নি বাবা। এখন আমায় কাতর কণ্ঠে বলল "মা আর তো সময় নেই, একটীবার কি পায়ের ধূলো পাব না ?" তাই এই আসছি তোকে ডাকতে।"

জ্যোতির্ম্ময় শুনতে শুনতেই পাগলের মত ছুটল নিচেয়, ঘরে ঢুকে দেখে ছুটী চক্ষু দরজায় রেখে ছিন্ন লতিকার মত মলিনা শয্যায় লুটাচ্ছে, ছুটে গিয়ে জ্যোতির্ম্ময় তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল, কান্না ভরা স্বরে বলে উঠল, "এমনি করেই কি আমার মাথায় অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তুমি পালাবে মলিনা ?" মলিনার নিষ্প্রভমুখ ক্ষণেকের তরে যেন স্বর্গের আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, পরক্ষণেই তার মাথা বালিশ থেকে গড়িয়ে জ্যোতির্ম্ময়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, হাতের ভিতর হাত হিমশীতল হয়ে গেল।

স্মৃতি সুধা

ফুল শয্যায় মধুযামিনী, নব বসন্তের নবীন মাধুরী ভরা নব বিকশিত নানা পুষ্প সৌরভে গৃহ আমোদিত করে দক্ষিণা বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে। ঘরের কড়ি হতে মেঝে পর্য্যন্ত মায় প্রতি ফার্নিচার ফুল দিয়ে সাজান। সেই ফুলময় ঘরে ফুলের আভরণে সজ্জিত বধূ-বর ফুলশয্যার খাটে বসে আছে কতক্ষণ; অপূর্ব্ব সে ছবি। দুজনের রূপে মর্ত্ত্যে স্বর্গের শোভা হেসে উঠেছে, যেন রতিমদন বিভোর প্রাণে জগতের বুকে ফুলশর নিক্ষেপ করবার আয়োজনে মেতে মশগুল প্রাণে বসে আছে। কতক্ষণ কেটে গেলে বিভা স্পন্দিত বক্ষে অপেক্ষা করে আছে, "এইবার বুঝি সুধা কণ্ঠ বেজে উঠবে,—না জানি কি বাণীই এই মধু লগ্নে তার কানে মধু ঢালবে! সেতো কতক্ষণই হতে চলল সেই অপেক্ষা করে তার কানকে সজাগ রেখে চোখকে পরিতৃপ্ত করছে; এক হাত মাত্র তফাতে খাটের দু'ধারে দুজনে বসে আছে পা ঝুলিয়ে। বিভা নত নেত্রে পুলকিত বিভোর চিত্তে "সেই শরণ লওয়া চরণ কমলের" মধু পান করছে একই ভাবে বসে। আহা কি দিয়ে বিধাতা এ চরণ দুখানি সৃষ্টি করেছিলেন গো! কালো নূতন পাম্পসু জুতায় সেই স্বর্ণ চাঁপায় তৈরি চরণ যুগলের অপূর্ব্ব শোভা ফুটে উঠেছে, দেখে দেখেও যেন আশা মেটে না। একী অপূর্ব্ব রূপ সম্পদ বিধাতা তাকে দান করলেন, কিন্তু গুণ? গুণ কেমন হবে কে জানে—

বিধাতা যাকে এমন সম্পদ দান করেছেন সে কি আর নির্গুণ হয়? তারপর অল্প একটু ঘাড় তুলে সম্মুখস্থিত আর্শিটার দিকে চেয়ে বিস্ময়ে পুলকে অবাক্ হয়ে গেল, একী চমৎকার শোভা! এমন কই কথন সে দেখে নি, কী সুন্দরই দেখাচ্ছে তাদের। কিন্তু ঐ লোকটি কথাই বলবে না নাকি আর? তার সখীরা যে সব তালিম দিয়েছে, তার সঙ্গে যে কিছুই মিলছে না; তাদের কথা মত হলে, এতক্ষণ তো লক্ষ কথা তাদের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এমন এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা চুপটি করে বসে থাকার কথা তো কারো মুখেই শুনি নি।" এই সব ভাবতে ভাবতে মুখটি তুলে যেমন চেয়ে দেখতে গেল যে লোকটি বুঝি বা জেগে জেগেই ঘুমুচ্ছে, সেই চুরি করে চাওয়ায় চারি চক্ষের মিলনে দু'জনেই হেসে ফেললে। বিমান এতক্ষণ তার দিকেই এক দৃষ্টে চেয়ে চুপটি করে বসেছিল। বিভাকে ফিরতে দেখে সে মধু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করল। বিভাও ধরা পড়ে মৃদু হেসে মুখ নত করল—অর্থাৎ হাসির প্রতিদানে হাসিই দিল! দু'জনের সুখের আনন্দের হিল্লোলে কুসুম সৌরভ মিশে মর্ত্যে স্বর্গ নিয়ে এল। হাসিমুখে চোখ নাচিয়ে বিমান জিজ্ঞাসা করল, "কি?" বিভা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল, "কিছু না।"—

বিমান বলল, "একেবারেই কিছু না?"

বিভা হাসিমুখে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "দেখছিলুম যে ঘুমুচ্ছ কি না?"

বিমান হেসে উত্তর দিল, "বটে, তা' কি রকম দেখলে?"

বিভা নত মুখে লজ্জিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে উত্তর দিল, "জানি না।"

বিমান বলল, "বিভা তোমার স্বপন মিলেছে তো? ঠিক উত্তর দাও, আজকের দিনে মিথ্যে বলতে নেই জান তো?"

বিভা উত্তর দিল, "মিথ্যা বলতে নেই, কিন্তু উত্তর না দিতে তো আছে।"

বিমান বলল, "দুষ্টুমী? এতক্ষণ ধরে তাই আমি লক্ষ্য করে চলেছিলুম যে কথা আমি বলতে পারি কিনা তোমার সঙ্গে, তুমি তা' চাও কিনা?"

বিভা বলল, "বুঝলে কিছু?"

বিমান বলল, "কি বুঝলুম বল না তুমিই?" পরে বলল, "বিভা আমার কল্পনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে; আমি আজ পরম সুখী, কেননা তোমার ঐ নির্ম্মল পবিত্র সুন্দর প্রাণ, যা' তুমি নিজে ব্যগ্র হয়েই আমায় দিলে, তাই পেয়ে আমি মর্ত্ত্যে স্বর্গ গড়বো। এস আজ, এই মধুযামিনীর সৃষ্টি-কর্ত্তাকে আমাদের অন্তরের আনন্দ জানাই। সুখের সময় প্রিয়জনকে ভুলে থাকা যায় না, বড় মনে পড়ে। এস এক মনে একবার তাঁর করুণার কথা স্মরণ করি, তার পরে তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে আমরা নূতন জীবনে অগ্রসর হব।"

খানিকক্ষণ চুপ চাপ।

বিমান দেখল বন্ধুদের উপহার দেওয়া কার্পেটে তোলা কবিতা— "দুই জীবনের নদী, একত্র মিলিল যদি, বল দেব! কার পানে আগ্রহে মিশিতে চায়' এই লেখাটির দিকে অন্যমনস্কের মত চেয়ে বসে আছে বিভা।

বিমান ডাকল, "বিভা!"

বিভা একটু যেন চম্‌কে উঠল, পরক্ষণে লজ্জিত হাসি মুখে চেয়ে দেখল।

বিমান বলল, "কি ভাবছ ?"

বিভা উত্তর দিল না কিছু।

বিমান বলল, "কথা বলছ না কেন বিভা ?"

বিভা উত্তর দিল, "মিথ্যে বলতে নেই এই মাত্র বললে যে।"

বিমান হাসল বলল, "সত্যিই বল বিভা।"

আবার বিভা নতমুখে চুপ করে রইল।

এবার বিমান ওর কাছে সরে এসে নিজের গলার একটা মালা খুলে নিয়ে বিভার গলায় পরিয়ে দিল, তার একখানি হাত আলগোছে ধরে বলল, "এবার বল বিভা, কি কথা আজ এই মধুযামিনীতে তোমায় বিমনা করে দেয়, এবার বল আমায়।"

বিভা বিমানের মুখের দিকে চাইল, বলল, বৌদিদিরা বলেন, "পুরুষদের ঐ রকম কটা বাঁধা গৎ আছে, তারা ঐ রকম মিষ্ট কথায় আমাদের সর্ব্বস্ব সেচ্ছায় সাগ্রহে দান করায়, তাদের অন্তরের কথা ও নয়। আমার দাদার এইবার নিয়ে চার বার ফুলশয্যা হল কিনা ?" ব'লে অন্যদিকে মুখ ফেরালে।

বিমানের হাত বিভার হাত থেকে পড়ে গেল। চমকিত বিস্মিত দৃষ্টিতে সে বিভার দিকে চেয়ে প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ বসে রইল কিছুক্ষণ। পরে বলল বিভার দু'হাত দু'হাতে নিয়ে, "বিভা, বিভা, চাও আমার দিকে— অশ্রদ্ধায় মুখ ফিরিয়ে থেক না আজ ; বিভা, সবায়ের প্রকৃতি সমান নয়, সে মেয়েরাও ; তুমিই বল সবায়ের প্রকৃতি কি সমান ? তারা হয়তো

চার বার ফুলশয্যা করার সুযোগ সুবিধা পায় না বলেই করে না, কিন্তু কত কিছু অসংযত প্রকৃতির পরিচয় দেয় তা'রা। বল বিভা, এতো ঢের শুনেছ; তেমনি সব পুরুষ সমান নয়। আজ যাকে তুমি তোমার পবিত্র প্রেম ধারায় অভিষিক্ত করে হাত ধরেছ; সে ওদের দলের নয়, তার ফুলশয্যা জীবনে দু'বার হবে না এবং কোন জন্মেই হয় নি ও হবে না। তুমি আমার জন্মজন্মান্তরের প্রিয়া। তা তোমায় দেখবা মাত্র আমার অন্তর চিনে নিয়েছে। অন্য কারো দিকে কখন এ চোখ চাইবে না, এ মন যাবে না। বিশ্বাস কর বিভা, আজ রাত্রি শেষেই যদি তাঁর নির্দেশে আমায় পরীক্ষার জন্য তোমায় কেড়ে নেন, তবু তুমি আমার অন্তরে চির জাগরিত হয়ে থাকবে। কেউ তোমার আসন নিতে পারবে না। আমায় বিশ্বাস কর বিভা, বাধ্য হয়ে আত্মদান আমি চাই না; তুমি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেমের মধ্য দিয়ে আমায় বরণ কর। দিতে এসে অকৃতজ্ঞ পুরুষজাতিকে স্মরণ করে ঐ বিমুখ মন, ছল ছল আঁখি আমায় যে কী দান করল তুমি বুঝবে না বিভা; বল, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে; বল, তোমার কল্পনার স্বর্গ আমি। বল, সত্য বল মনে একটুও অবিশ্বাসের রং লেগে আছে কিনা? আজ মিথ্যা বলতে নেই জান তো?"

বিভা জল ভরা চোখে হাসি মুখে বিমানের দিকে চাইল, বলল, "বিশ্বাস করলুম, জানি—সবার প্রকৃতি সমান নয়।"

মাত্র দু'টি বছরের মধু বসন্ত তারা ভোগ করেছে। তাদের চাঁদের দেশ থেকে আসা ছেলে "চুমু" মাত্র ছ'মাসের; একটি দিনের কাল ব্যাধিতে বিমানের বিভাকে কেড়ে নিল। বিভা যখন রোগের যুদ্ধ

শেষে একটু সুস্থ হয়ে চোখ খুলল, দেখল যে সেই দিনের মতই বিমান ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে ঝুঁকে চেয়ে রয়েছে। চোখ খুলতেই সেকথা মনে প'ড়ে বিভাকে ভুলিয়ে দিল তার রোগ শয্যার কথা, তার রোগ যন্ত্রণার অনুভূতি; সে সেই সেদিনের মত করুণ সুন্দর হাসি দিয়ে বিমানকে অভিষিক্ত করল, বিমানও একটু ম্লান হাসি হাসল, তার একটি হাত হাতে নিয়ে বিমান বলল, "বিভা, বিভা, কেন এমন অসুখ করল তোমার? এখন কেমন বোধ করছ?"

বিভা বলল, "ভাল, কিন্তু আমি যে চললুম; ওগো আমার তুমি, আমার চুমু, এসব কাকে দিয়ে যাব আমি? কি করে তোমাদের রেখে যাই গো? এত শীঘ্র ডাক দিলেন তিনি কেন?"

চোখের জল রোধ করতে করতে বিমান বলল, "কাকে আর দিয়ে যাবে বিভা, তোমার জিনিষ তোমারই রইল। আবার আমরা পরস্পরকে ফিরে পাব। কটা দিনের বিচ্ছেদ বই তো নয়? তাঁর বিধানকে সর্ব্বদা নত মস্তকে আমাদের মানতেই হবে বিভা, অমঙ্গলের ভিতরও তিনি মঙ্গল করেন সে! আমাদের কোন অবস্থাতেই একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় বিভা, আর কি ভাবছ বিভা, যাঁর তোমাকে ডাক পড়েছে তাঁর কথা একবার ভাব; তাঁর কাছে যাচ্ছ কিসের ভাবনা কিসের ভয়? আর কি ভাবছ বল বিভা, তোমার "চুমু" আমার কাছে রইল তার জন্য ভাবনা কি বিভা?"

বিভা ছোট্ট করে বলল, "না কিছু না" তারপর পরিতৃপ্ত নিশ্চিন্ত মনে চোখ মুদল।

তারপর কতদিন গত হয়ে গেছে; কত মধু বসন্ত, কত মেঘম্লান শ্রাবণ

অতীতের স্মৃতিজড়িত হয়ে বিমানের জীবনে এল গেল। সেই চব্বিশ বছরের যুবক আজ পৌঢ় হয়েছে, দেশের দশের সে একজন মাথা এখন। লোকের মুখে মুখে তার কথা ফেরে, তার আদর্শ চরিত্রের কথার গাথা ঘরে ঘরে আলোচিত হয়।

সেই চব্বিশ বছর থেকে কত শত কন্যাদায়গ্রস্ত পীড়িত পিতার কাতরোক্তি, কত শত অতুলনীয়া রূপসীর রূপ গুণের আকর্ষণ, এবং তার জননীর,—একটী মাত্র পুত্রের জননীর আকুতি, কিছুই তাকে বিন্দু মাত্র টলাতে পারে নি। তার হৃদয়ের সেই মধু ছবি, সে যে চির অম্লান, চির জাগরিত। আজ যদি 'চুমু'র মা-ই কেবল থাকত তার বাবা না থেকে, তবে সে যে কি ভাবে জীবন কাটাত, এই কথা সর্ব্বক্ষণ বিমানকে সচকিত রেখে তার বিন্দুমাত্র সুখ সম্ভোগের ইচ্ছাকেও চাবুক দিয়ে সজাগ করত। বাপ, মা, আর তার বিভার "চুমু" এই নিয়ে তার ছোট্ট সংসার দিব্য শান্তি সুখে চলে যাচ্ছিল। "চুমু" বাপের নয়ন মণি হয়ে পিতামহীর স্নেহের ক্রোড়ে মানুষ হচ্ছিল। বিমানের একমাত্র কাজ ছিল ছেলেকে সর্ব্বোচ্চ আদর্শে মানুষ করা; এবং সে পিতামাতার একমাত্র সন্তান; তাঁরা অনেক কষ্টে তাকে যে বড় হবার সুযোগ দিয়ে মানুষ করেছেন, এজন্যে কি করে সে উচ্চ শীর্ষে উঠে তাঁদের সেই সুযোগ দেওয়ার দুঃখ পাওয়াকে সার্থক করে তুলবে, সেই চেষ্টায় কায় মন ঢেলে দিয়েছিল। তারপর একদিন সেই দিন এল,—যেদিন সকলে বিস্মিত আঁখির সঙ্গে চেয়ে দেখল, বিমান উন্নতির উচ্চশীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"কিন্তু যারা তার এই কৃতিত্বে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দিত হবে,

গৌরবান্বিত হবে তার নিজের চেয়েও বেশী, তারা আজ কোথায়? তার মা, সেও আজ কয় মাস পূর্ব্বে স্বর্গে চলে গেছেন। পুত্রের এই কীর্ত্তি, এই যশ, এই গৌরব তিনি কি দেখতে পেয়ে সুখের হাসি হাসছেন? আর বিভা, আজ তার বিভা যদি থাকত! তার কাছে যে সবই তুচ্ছ, এই কীর্ত্তি, এই যশ, এই গৌরব; বিভাকে হারিয়ে এ সবের তার কাছে কিসের মূল্য? যেদিন দেখা হবে বিভার সঙ্গে—এই যশ কীর্ত্তি গৌরবের মুকুট শিরে দাঁড়াব তার সম্মুখে,—সেদিনে বিভার দৃষ্টিকে এর দ্বারা আরও উদ্ভাসিত করে তুলেছে দেখতে পাব তো?"—বিমানের এই নিভৃত-চিন্তা।

সমাপ্ত